জাপানীদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাব

গবেষক
[illegible]
এম.ফিল. গবেষক
রেজি নং [illegible]
[illegible] বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. [illegible] রহমান
অধ্যাপক
[illegible] বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

জাপানীদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাব

গবেষক

এস.এম.খালেকুজ্জামান

এম.ফিল গবেষক

রেজি.নং ১০৮/২০০৮-২০০৯

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান

অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এস.এম.খালেকুজ্জামান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত **"জাপানীদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাব"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। আমার জানামতে এটি একটি তথ্যবহুল ও গবেষণাধর্মী কর্ম এবং ইতিপূর্বে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য এ শিরোনামে কোন গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি। আমি পান্ডুলিপিটি পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপাস্থাপনের সুপারিশ করছি।

465263

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৯.৩.১২

(ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"জাপানীদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাব"**শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার এই গবেষণা পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ হয়নি কিংবা অন্য কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য কোথাও উপস্থাপন করা হয়নি।

465263

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

১৭.০৬.১২

(এস.এম.খালেকুজ্জামান)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মহান আল্লাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার এ গবেষণা কর্মটি **(জাপানীদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় বিশ্বাস ও তার প্রভাব)** সম্পন্ন করতে পেরে তার দরবারে অশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন করছি এবং অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি তার রাসূল হযরত মুহাম্মদ(সঃ) ও তার পরিবারবর্গের প্রতি।

আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে অশেষ শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা ভাজনে আবদ্ধ হয়েছেন আমর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শফিকুর রহমান। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভাব হয়েছে এবং তার মূল্যবান পরার্মশ ও দিকনির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়, উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সাহায্য সহযোগিতায়। এ জন্য তাঁর প্রতি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর দীর্ঘায়ূ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমার আব্বা এস.এম.আলমগীর হোসেন ও মা মোছাঃ আঞ্জুমানারা বেগম এবং আমার সহপাঠী মোছাঃ সুবর্ণা আফরিন সহ পরিবারের অন্যান্য সকল সদস্যের প্রতি। আমি স্বকৃতজ্ঞচিত্তে মহান আল্লাহর দরবারে তাদের জীবনের সুখ-শান্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতি কামনা করছি।

Dhaka University Institutional Repository

আমার গবেষণার কাজে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন এবং অনেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি। তার মধ্যে জাপানী ভাষা বিভাগের সহকারি অধ্যাপক মুহাম্মদ আনছারুল আলম, সহকারি অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মুজিব, সহযোগি অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম ফকির, নাকাইয়ামা, জাপান ফাউন্ডেশনের শিক্ষক শিরাই সেনসেই এবং বিশেষ করে জাপানী দূতাবাসকে আন্তরিক অভিন্দন জানাই। এদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজের গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় আমি বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকের সাহায্য নিয়েছি। ঐ সব লেখকের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমার অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতপর্বে যারা বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাদের মধ্যে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সহকারী অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আবুল বাসার এর প্রতি থাকল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া আরো বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

খালেকুজ্জামান ১৮.০৬.১২

(এস.এম.খালেকুজ্জামান)
এম.ফিল গবেষক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জাপান সূর্যোদয়ের দেশ নামে পরিচিত। এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। দেশটি একটি দ্বীপপুঞ্জ। জাপান নিপ্পন নামেও পরিচিত। নিপ্পন কথার অর্থ "সূর্যের উৎপত্তি"। চারটি বৃহৎ দ্বীপ এবং সংলগ্ন প্রায় সহস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমবেতভাবে দ্বীপপুঞ্জটি। জাপানের চারটি বৃহৎ দ্বীপ হচ্ছে- হোক্কাইডো, হনশু, শিকোকু এবং ক্যুশু। জাপানের চারপাশে স্থলবেষ্টিত। জাপান সাগর এবং পূর্ব চীন সাগর জাপানকে এশীয় ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জাপানের এরূপ ভৌগলিক অবস্থান ও বিচ্ছিন্নতা জাপানের ভাবীকালের ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে।

জাপান বর্তমান বিশ্বে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভাবের কারণ যে শুধু তাদের কর্মদক্ষতা তাই নয় পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানবতাবোধ তাদের অর্থনৈতিকভাবে এ পর্যায়ে আনতে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে বা রাখছে। জাপানীদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত উন্নতি নয় সমষ্টিগত উন্নতিই তাদের লক্ষ্য। যা আমাদের দেশের জনগণের লক্ষ্যের বিপরীত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়।

টোকিওর সুমিটোমো করপোরেশন অফিস। মন দিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন গো ওয়াতানাবে। প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন। প্রথম দিন অফিস থেকে পিএ সিষ্টেমে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'আপনারা চাইলে বাড়ি চলে যেতে পারেন। 'দ্বিতীয় দিন বলা হয়, 'আপনারা বরং চলেই যান। তৃতীয় দিন ঘোষনা হয় সরাসরি, 'বাড়ি যান। অফিস থেকে এহেন তাগাদা সত্ত্বেও আরও কয়েকজনের মতো ওয়াতানাবে কাজ করেই যাচ্ছিলেন। কখনো বা রাত দুইটা পযর্ন্ত!

Dhaka University Institutional Repository

জাপানিদের কর্মসংস্কৃতি ঈর্ষাণীয়। পাশ্চাত্যের মানুষ দুই দিনের সপ্তাহান্ত কাটাতে গিয়ে তিন-চারদিন আয় করে নষ্ট করে বলে জাপানিরা রাগ করে থাকে। শত দুর্যোগের মধ্যেও তারা কর্তব্য পালনে কখনো পিছপা নয়। এবারের নজিরবিহীন ভূমিকম্প ও তা থেকে সৃষ্ট সুনামির পরও আর একবার পাওয়া গেল এর নজির। কেবল কর্তব্যনিষ্ঠাই নয়, ভয়াবহতম বিপর্যয়ের মুখেও জাপানিরা কীভাবে অবিচলীত থাকতে পারে তাও দেখল বিশ্ববাসী। বাইরের দুনিয়ার কাছে এ এক বিস্ময়। দুর্যোগ মোকাবিলায় জাপানিরা কী করছে, এর বিবরণের পাশাপাশি তাদের স্বভাব ও মানসিকতার এই বিশেষ দিকটির কথাও সমান গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হচ্ছে।

ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ফুকুশিমা দাইচি পারমাণবিক বিদ্যুৎকন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা। ঐ বিদ্যুৎকেন্দ্রের ৩০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকা বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতি মৃত্যুফাঁদ হয়ে ওঠা ফুকুশিমা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ২০০ জন কর্মী প্রায় নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও সেখানে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই ঐ ২০০ টেকনিশিয়ান সেখানকার ত্রুটি মেরামতে দিন-রাত কাজ করে যেতে থাকেন। প্রতি শিফটে কাজ করেন ৫০ জন, যাঁরা এখন পুরো বিশ্বের কাছে ফুকুশিমা ফিফ্‌টি নামে পরিচিত। দেশ ও জাতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা চালিয়ে যেতে থাকেন কার্যত আত্মঘাতী এই মিশন। ফুকুশিমা ফিফ্‌টির একজন বলেছেন, তাঁরা জানেন মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু এর পরও তাঁরা এটা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা একে গ্রহণ করেছন সামাজিকভাবে দেওয়া মৃত্যুদন্ড হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যুদ্ধবিগ্রহের সময়ে বিশৃঙ্খলা, লুটপাট অস্বাভাবিক কিছু নয়। এটা সাধারণ ঘটনা। হারিকেন- ক্যাটরিনার সময় যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে লুটপাট হয়েছে। কিন্তু জাপানে এবারের সুনামির ধ্বংসযজ্ঞ, ঘন্টার পর ঘন্টা আদৌ বিদুৎ না থাকা এবং আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও বলতে গেলে তেমন কিছুই হয়নি, অনেক জায়গায় দেখা গেছে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে জাপানিরা দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনছে। অথচ দেখা গেছে, পাশেই পণ্যে ঠাসা এমন দোকান আছে যাতে কোনো কর্মী নেই। দরজাও খোলা। চাইলেই জিনিস নিয়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকায়নি লাইনে দাঁড়ানো লোকেরা। সুনামীর পর কিছু চুরির ঘটনা ঘটেছে বটে। কিন্তু তা পরিস্থিতির ভয়াবহতার তুলনায় নগণ্য বলেই মনে করেন সবাই।

জাপানিদের মধ্যে দুর্যোগ ও বিপদ-আপদে আতঙ্কিত হওয়ার প্রবণতা খুব কম। এর কারণ ব্যাখ্যা করে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত সেন্দাই শহরের পৌর কর্মকর্তা মাচিকো কুনো বললেন, তাঁরা ভাবেন, কেউ আতিঙ্কত হলে দেখাদেখি অন্যরাও ভয় পেয়ে যাবে। এতে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে। তাই শত বিপদেও তাঁরা স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেন।

মাচিকো কুনো জানালেন, দুর্যোগের পর সেন্দাই এলাকা থেকে অনেকে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। আবার অনেকে সেখানে ছুটে যান সহায্যের জন্য। এ জন্য সেন্দাইয়ে ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর পরও কাউকে তাড়াহুড়ো করতে দেখা যায়নি। এমনকি একটি গাড়ি হর্নও বাজায় নি বা ওভারটেক করার চেষ্টা করেনি।

Dhaka University Institutional Repository

টোকিওর টেম্পল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জেফ কিংসটন বলেন, বড় বিপর্যয়ে জাপানিদের ভেতরটা কান্নায় মোচড়ালেও তারা মুখে হাসি ধরে রাখে। এমনও শোনা গেছে, কোনো স্বজন মারা যাওয়ার পরও অনেকে জোরে কান্নাকাটি করে না-পাশের বাড়ির লোকজেনর অসুবিধা হতে পারে ভেবে।

পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণাটিও জাপানিদের মধ্যে প্রবল। এ ব্যাপারে বিশ্লেষক আই ওনোর ভাষ্য হচ্ছে, 'জাপান বেশ ছোট একটা দেশ। তাই লোকে ভাবে প্রতিবেশীর বিপদাপদ নিজের বিপদেরই মতো।

জাপানিদের সহনশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একজন পর্যবেক্ষক তাঁদের সংস্কৃতির একটি আপাত ছোট কিন্তু কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় তুলে ধরেছেন। সেটি হলো পরস্পরের কাছ থেকে বিদায়ের সময় জাপানিরা বলে থাকে গানবাত্তে কুদাসাই যার কাছাকাছি অর্থ হাল ছেড়ো না। দুটি বিশ্বযুদ্ধ সামাল দিয়ে দ্বীপের দেশ জাপান অনেক দিন ধরেই বিশ্বের কয়েকটি শীর্ষ ধনী দেশের একটি। ভূখন্ড বা প্রাকৃতিক সম্পদ না থাকা সত্ত্বেও মূলত পরিশ্রম, মেধা ও কর্মনৈপূন্যের বলে উন্নতির স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করেছে। এর পেছনে তাদের অন্যতম মন্ত্র নিশ্চয়ই 'গানবাত্তে কুদাসাই'।

প্রাচীনকালে জাপানে তিনটি ধর্ম প্রচলিত ছিল-শিন্তোধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ও কনফিউসীয়সধর্ম। শিন্তোধর্ম বা পূর্বপুরুষের উপাসনা জাপানীদের আদিম ধর্ম রুপে পরিগণিত। এই ধর্ম সংস্কারমূলক, অধ্যাত্মিকতামুলক নয়। এই ধর্ম জাপানী সম্রাট এবং পূর্বপুরুষদেরকে দেবতা জ্ঞানে মান্য করে। তাই প্রথম সম্রাট জিম্মু শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত নামে পরিচিত নন, তার পূর্ণ পরিচয় জিম্মু টেন্নো বা দিব্য সম্রাট।

Dhaka University Institutional Repository

শিন্তো ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুদেবতাবাদ। প্রাচীন জাপানীরা বহুদেবদেবীর (যথা সূর্যদেবতা, অগ্নিদেবতা, বৃষ্টিদেবতা, ভূমিকম্পের দেবতা) তথা প্রেত এবং অলৌকিক শক্তির পূজা করতেন। এই ধরনের একাধিক দেবদেবীর ও অলৌকিক শক্তির পূজাকে জাপানীরা বলতেন কামি-র (Kami) উপাসনা বা কামির পথ। আবার যেহেতু শিন্তো ধর্ম জাপানী পূর্বপুরূষ ও জাপানী সম্রাটের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রেরণা দেয়, সেই কারণে ইহা জাপানী জাতির মধ্যে দেশপ্রেম জাগরণের সহায়ক, স্বদেশানুরাগকে সুতীব্র করে তোলবার উপায়।

আনুমানিক খ্রীষ্টজন্মের ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে জাপানে বৌদ্ধধর্মের সূত্রপাত হয়। রক্ষণীশীল শিন্তো ধর্মাবলম্বীদের উপেক্ষা এবং প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্ম স্বল্পকালের মধ্যে জাপান অন্যতম প্রধান ধর্মরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। গৌতমবুদ্ধের বাণী জাপানে প্রচারিত হয় প্রত্যক্ষভাবে চীন থেকে কিংবা পরোক্ষভাবে চীনের মাধ্যমে কোরিয়া থেকে। স্বয়ং জাপানী সম্রাট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। ফলে শিন্তোধর্ম তা প্রধান্য হারলেও কিন্তু সম্পুর্ণরূপে অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে টোকুগাওয়া শোগুনদের শাসনবাসানের পরে জাপানে মেজিযুগ বা আধুনিক এর সূচনা হয়। তখন শিন্তোধর্ম পুণরায় তার হৃত গৌরব ফিরে পায় এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

প্রাচীন গৌরব কনফিউয়াস (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১-৫৭৯) ছিলেন একাধারে ধর্ম প্রচারক ও বাস্তবধর্মী রাজনৈতিক। প্রকৃতপক্ষে তাকে ধর্ম প্রচারক অ্যাখ্যা না দিয়ে নীতি প্রচারকরূপে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি চীন জাতিকে তথা বিশ্ববাসীকে উহার দেন অতিব উচ্চমানের কতকগুলো নৈতিক নিয়মাবলী। তিনি মনুষ্য চরিত্রে

Dhaka University Institutional Repository

প্রধানত: পাঁচটি নৈতিক গুনের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরো করেছেন। যথা দানশীলতা, পবিত্রতা, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততা।

শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কনফিউসীয়স ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও জাপানীরা মূলত ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উপর দেশ প্রেমকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। জনৈক বিদেশী পর্যটক বৌদ্বধর্মের প্রতি জাপানীদের অনুরাগ দেখে এক সুপ্রসিদ্ধ জাপানী পুরোহিতকে একদা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মহাশয়, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হয়ে জাপান আক্রমণ করেন তা হলে আপনারা কি করবেন? প্রত্যুত্তরে পুরোহিত মহাশয় নাকি বলেছিলেন-তাহলে বুদ্ধের শিরচ্ছেদ করে মুন্ড দিয়ে জন্মভূমির পূজা করব।

মেজি বা আধুনিক যুগের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাদর মধ্যে 'শোনান' স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সুপন্ডিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠাপোষক। তিনি জাপানের রক্ষণশীল নীতি ত্যাগের পক্ষপাতি ছিলেন এবং আমেরিকার সমর্থক ছিলেন। তিনি বলতেন খ্রীষ্টধর্ম ইউরোপ জনমনকে ঐক্যবদ্ধ করেছে অথচ জাপানে শিন্তো, কনফিউসীয়স ধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

জাপানের নিজস্ব ধর্ম হল শিন্তো। পরে চীনদের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে তারা বুদ্ধ ধর্মের সংস্পর্শে আসে। শিন্তো ধর্মের প্রকৃতি যেমন সূর্য, চন্দ্র, বাতাস ও সমুদ্রের পূজা করে। আবার মানুষ তেমনি জাপানী সম্রাটাকেও পূজা করা হয়। পাশ্চাত্যের ধারণা শিন্তো ধর্মের সম্রাট পূজা থেকেই জাপানী মিলিটারিজম বা

Dhaka University Institutional Repository

সামরিকবাদ এর সৃষ্টি। জাপানীরা সাধারণত আনন্দের অনুষ্ঠান, জন্ম ও বিয়ের সময় শিন্তো তীর্থকেন্দ্রে যায়, কিন্তু মৃত্যের পর অনুষ্ঠানের জন্য বুদ্ধমন্দিরে যায়।

তবে জাপানীদের মাঝে যেমনি শিন্তোধর্মের মূর্তি দেখা যায় তেমনি বুদ্ধধর্মের মন্দিরও দেখা যায়। কথিত আছে জাপানীদের ৭০-৮০ শতাংশ মানুষ কোন না কোন ধর্মের অনুসারী প্রকৃতার্থে তারা কোন ধর্মের প্রতিই তেমন অনুরাগী নয়। তাদের কিন্তু দেশপ্রেমই বড় ধর্ম।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়ঃ

জাপানের ভৌগলিক পরিচিতি ও ইতিহাস;.....১৪-৪৩

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

জাপানী সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি;.....৪৪-৮৪

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

জাপানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ধর্মীয় বিশ্বাস;.....৮৫-১১৪

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

জাপানে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ;.....১১৫-১৪০

পঞ্চমঅধ্যায়ঃ

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জাপানের অবস্থান,তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রভাব.....১৪১-১৪৮

উপসংহার:.....১৪৯-১৫০

গ্রন্থপুঞ্জীঃ.....১৫১-১৫৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

জাপানের ভৌগলিক পরিচিতি ও ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

আয়তন

জাপানের আয়তন ৩,৭৭,৮৭৩ বর্গ কিলোমিটার। ২০০৬ সালে আয়তন ছিল ৩,৭৭,৯২৩.১ বর্গ কিমি। স্থল সীমার আয়তন ৩৭৪,৮৩৪ বর্গ কিমি, জল সীমার আয়তন ৩০৯১ বর্গ কিমি। এর অবস্থান ২০°২৫′ থেকে ৪৫°৩৩′ উত্তর অক্ষাংশ বরাবর। হোক্কাইডো ৮৩৪৫৩ বর্গ কি.মি., হোনশু ২৩১০৭৮ বর্গ কি.মি., শিকোকু ১৮৭৮৮ বর্গ কি.মি., কিউশু ৪২১৬৫ বর্গ কি.মি.এবং ওকিনাওয়া দ্বীপের আয়তন ২.২৭১ বর্গ কি.মি.[১]।

রাজধানী

জাপানের রাজধানীর নাম টোকিও[২]। টোকিওতে আছে রাজপ্রাসাদ, ডায়েট এবং সুপ্রিম কোর্ট। জাপানের অর্থনীতির কেন্দ্র হল টোকিও। টোকিও এর আয়তন ২১৮৭ বর্গ কি.মি এবং লোক সংখ্যা ১২০৬৪০০০জন।

জনসংখ্যা

টোকিও পৃথিবীর মধ্যে একটি জনবহুল শহর। ২০১০ সালের পরিসংখ্যান মতে টোকিও এর আয়তন ২,১৮৭ বর্গকিলোমিটার এবং বসবাসকারী জনসংখ্যা ১২,০৬৪,০০০ জন। জাপানের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যাধিক। ১৮৬৮ সালে মেইজি রেষ্টোরেশনের সময় জাপানের জনসংখ্যা ছিলো ৩৩ মিলিয়ন। এটি ২০০০ সালে এসে দাঁড়ায় ১২৬,৯২৬,০০০ জন। জাপানে ২০০০ সালে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৩৪০ জন। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে বিশ্বের মধ্যে জাপানের স্থান চতুর্থ[৩]।

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-প্রকৃতি

জাপানকে বলা হয় ভূমিকম্পের দেশ। প্রায় দিনেই ছোট বড় রিখটার স্কেলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। সে কারণে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর জন্য ঘর বাড়ীগুলো সাধাণত কাঠের তৈরী হয়ে থাকে। এছাড়া জাপানে এমন সব বড় বড় বিল্ডিং আছে যেগুলো স্প্রিং সিষ্টেম অর্থাৎ ভূমিকম্প হলে বিল্ডিংগুলো কাপ্‌তে থাকবে কিন্তু ধ্বংস তথা ভেঙ্গে পড়বে না।

জাপানের ভূ-প্রকৃতির অন্যতম দিক হচ্ছে দেশটি সংস্রাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমবেত একটি দেশ। জাপানের চারটি বৃহৎ দ্বীপ হচ্ছে হোক্কাইডো, হনশু , শিকোকু এবং কিউশু। জাপানের চারপাশ স্থল বেষ্টিত। জাপানে অনেক পাহাড় দেখা যায় তবে পাহাড়গুলোর উপর অনক ধরণের বড় বড় গাছ থাকায় পাহাড়গুলো দেখে মনে হয় বিস্তৃর্ণ জায়গা যা গাছ দ্বারা পরিবেষ্টিত।

জাপানে ছোট বড় অগ্নেয়গিরি দেখা যায়। বর্তমান প্রায় ৮৬টি জীবন্ত অগ্নেয়গিরি রয়েছে। জাপানে সমতল ভূমি কম থাকায় পাহাড়ের উপরে অনেক সুসজ্জিত ঘর বাড়ী তৈরী করে থাকে। জাপানে পাহাড় ঘেঁষে ছোট বড় নদীর উৎপত্তি হয়েছে। অন্যান্য দেশের মত জাপানেও নদী এবং সমুদ্রের তীরে ছোট বড় শহর গড়ে ওঠেছে। যেমন টেকিও শহরটি আরাকাওয়া নদীর তীরে অবস্থিত। সেগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক ভূমিকা রাখছে।

Dhaka University Institutional Repository

জলবায়ু

এশিয়া মহাদেশের পূর্ব-উপকুল মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল। জাপানে বছরে কোন কোন সময় যেমন অনেক বৃষ্টিপাত হয়, তেমনি কোন কোন সময় অনেক গরম পড়ে। গাঠনিক দিক থেকে ভূমি বিভিন্ন রকম হওয়ায় জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়।

জাপানের চারটি ঋতু রয়েছে। ঋতু গুলা হলোঃ

১. বসন্ত কাল

২. গ্রীষ্ম কাল

৩. বর্ষা কাল

৪. শীত কাল

বসন্তকাল

জাপানী ভাষায় বসন্তকালকে হারু বলা হয়। বসন্তকালে জাপানে অনেক ধরনের ফুল ফোটে। জাপানীরা সৌন্দর্য প্রিয়। জাপানে ফ্লাওয়ার অ্যারেজমেন্ট যা জাপানী ভাষায় ইকেবানা নামে পরিচিত । ফুল গাছকে সুন্দর করে কেটে সাজিয়ে থাকে। জাপানের জাতীয় ফুলের নাম সাকুরা, বসন্তকালে সাকুরা ফুল পরিপূর্ণ ভাবে ফোঁটে। এই সাকুরা ফুল ফোটারও একটি উৎসব আছে যা হানামী নামে পরিচিতি। হানামীর দিনে ছোট- বড় সবাই সাকুরা গাছের নীচে মাদুর বিছিয়ে খাবার ও পানি, মদ নিয়ে যায় এবং সেখানে তারা ফুল ফোটা উপভোগ করে ।

Dhaka University Institutional Repository

বসন্তকালে বিশেষ করে মার্চ মাসে নিম্ন চাপ দেখা যায়। এই নিম্নচাপ জাপান সাগর থেকে শুরু হয়ে পুরো জাপানের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। নিম্নচাপ জনিত বায়ু দক্ষিণ দিকে থেকে বয়ে আসে। একে বলা হয় হারু ইচিবান [৪]।

গ্রীষ্মকাল

জাপানী ভাষায় গ্রীষ্মকালকে নাৎসু বলা হয়। গ্রীষ্মকাল জুনের শুরুতে হয় এ সময় বর্ষা এবং গরম দু'টোই অনুভূত হয়। এই সময়ে বৃষ্টিপাত জাপানের দক্ষিণ অংশ থকে শুরু হয়ে উত্তর দিকে যায়। এবং ২০ জুলাই দিকে এ বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়। জুলাইয়ের শেষের দিকে এ কালের বৈশিষ্ট্য শেষ হলেও এর তাপমাত্রা আগষ্ট পর্যন্ত অনুভূত হয় [৫]।

বর্ষাকাল

সেপ্টেম্বর মাস থেকে বর্ষাকাল শুরু হয়। এই সময়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত সহ ঝড়ো হাওয়া দেখা যায় । যেমন টাইফুন, সুনামী বিশেষ করে এ সময় দেখা যায়।

শীতকাল

জাপানী ভাষায় শীতকালকে ফুয়ু বলে। এ সময় তুষার পাত হয়ে থাকে। আর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে শুষ্ক বাতাস প্রবাহিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ

২০০০ সাল জাপান ১১টি স্থানকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসাবে ঘোষণা করে[৬]। স্থানগুলো হলোঃ

১. ইকুশিমা দ্বীপ (১৯৯৩): এই দ্বীপে **Ciyptomeria tree** নামে ৩,০০০ বছরের পুরোনো গাছ আছে।

২. হিমজী দূর্গ (১৯৯৩),

৩. গাছুকু দূর্গ (২০০০): এটি ওকিনেওয়া দ্বীপে অবস্থিত।

৪. নিক্কো (১৯৯৯): এটি একটি পবিত্র স্থান যেখানে মন্দির আছে।

৫. শ্রীকাওয়া এবং গোজাইয়ামা (গ্রাম) (১৯৯৫),

৬. হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল (১৯৯৬),

৭. শিরাকামী পাহাড় (১৯৯৩) ,

৮. হোরিওজি এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান।

৯. কিয়োটার ঐতিহাসিক মন্দির (১৯৯৪),

১০.পবিত্র ইশুকুশিমা (১৯৯৬),

১১.নারার ঐতিহাসিক মন্দির (১৯৯৮),

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের জাতীয় পার্ক

২০০১ সালে জাপানে জাতীয় পার্কের সংখ্যা ছিল ২৮টি [৭]।

ফুজি হাকোনে ইজু জাতীয় পার্ক:

এটি জাপানের সবচেয়ে উচু ফুজি পর্বতের পাশ্বে অবস্থিত। এই পার্ক মূলত ফুজি পর্বতের অংশ বিশেষ। পর্যটকগণ ফুজি পর্বতের উপরে উঠে এই পার্কের সৌন্দর্য উপভোগ করে।

১. রিকুচু উপকুলীয় জাতীয় পার্ক

২. দাইছেনওকি জাতীয় পার্ক

৩. আকান জাতীয় পার্ক

জাপানের ইতিহাস

প্রাচীন কিংবদন্তী অনুযায়ী সূর্যের আশীর্বাদে জাপানের সম্রাট বংশের উৎপত্তি হয়েছিল। জাপানে সূর্যকে দেবী হিসেবে কল্পনা করা হয়ে থাকে। সূর্যদেবীর আশীর্বাদ ধন্য ইজানাগী নামে এক দেবতা ও ইজানামী নামে এক দেবীর বংশধরেরা জাপান দ্বীপপুঞ্জের শাসনের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। কিংবদন্তীর পরবর্তী পর্যায় থেকে জানা যায় যে, সূর্যদেবী তার এক পৌত্রকে জাপানের শাসনকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পৌত্রটি কিউশুর অন্তর্গত তাকাচিহো পর্বতে এসে বসতি স্থাপন করেন। বসতি স্থাপনের সময় তার হাতে ছিল একটি দর্পন, একটি তলোয়ার এবং এক ছড়া মাণিক্যের মালা। এই জিনিসগুলি নাকি এখনও জাপানের রাজপ্রাসাদে রক্ষিত আছে। সূর্যদেবীর এই পৌত্রের প্রপৌত্রের নাম জিম্মু তেন্নো (Jimmu Tenno)। জাপানী কিংবদন্তী অনুযায়ী এই জিম্মু তেন্নো ছিলেন জাপানের সর্বপ্রথম স্বীকৃত সম্রাট। ৬৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। কিয়োটোর দক্ষিণে অবস্থিত ইয়াখটো প্রদেশে তাঁর রাজধানী ছিল।

অনেকের মতে বিশেষ করে ইউরোপীয় এবং জাপানী ঐতিহাসিকদের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই যে, ৬৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জিম্মু তেন্নো কর্তৃক জাপানী রাজবংশ প্রতিষ্ঠার ঘটনা নিছক পৌরাণিক একটি কাহিনী মাত্র। এর পেছনে আদৌ কোন ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। জিম্মু তেন্নো কর্তৃক জাপানের রাজবংশের প্রতিষ্ঠার কথা জাপানীদের দু'টি অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ 'কোজিকি'(৭১২) এবং 'নিহন নোকিতে' (৭২০) লিপিবদ্ধ রয়েছে। অবশ্য এই দুটি বইয়ের তথ্য নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে মনে করেন। জাপানী রাজপরিবারের মর্যাদা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থ দু'টি রচিত হয়েছিল [৮]।

ইতিহাসে শোগুন যুগের উৎপত্তি

জাপানী প্রবাদ অনুসারে, জাপানের প্রথম সম্রাট জিম্মু ছিলেন সূর্য-বংশোদ্ভুত। তাই তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতেন দৈব অধিকারে। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক নেতা ও ধর্মীয় গুরু, একাধারে সিজার এবং পোপ। তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁরাও দৈব অধিকারেই রাজত্ব ক'রে গেছেন [৯]। জাপানিরাও তাঁদের সম্রাটের উপর দেবত্ব আরোপ করে তাকে শ্রদ্ধাবনতা চিত্তে দেশের সর্বময় অধীশ্বর হিসাবে মান্য করতেন। কিন্তু কালক্রমে জাপানী সম্রাটের পক্ষে দেশের উপর একচ্ছত্র অধিপত্য বজায় রাখা দুষ্কর হয়ে ওঠে, ক্ষমতা লোলুপ কয়েকটি বংশের চক্রান্তে। এই সব বংশের বসতি ছিল রাজধানী কিয়োটোতে। এরা ছিল নিষ্কর জমির মালিক এবং এদের অধীনে থাকত যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বহু প্রজা ও অনুচর। এই সব বংশ সম্রাট-বিরোধী প্রচারেও বিরত ছিল না। তাদের বক্তব্য, সম্রাটের যখন দেব-বংশে জন্ম তখন তাঁর পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা-রূপ জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত না থেকে নিজের তথা দেশবাসীর

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য রাজপ্রসাদের আধ্যাত্মিক চিন্তায় কালতিপাত করাই শোভন এবং যুক্তিযুক্ত। এই সব বংশ যে স্ট্রাটেজি'অবলম্বন করে রাজক্ষমতা হরণে অগ্রসর হয় তা ছিল সম্রাটকে সিংহাসনে বহাল রেখে সুকৌশলে তাঁর অধিকার থেকে দেশের প্রকৃত শাসনভার ছিনিয়ে নেওয়া এবং সেইসঙ্গে সম্রাট যাতে রাজপ্রসাদের অত্যধিক বিলাস-ব্যসনের মধ্যে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে জটিল রাজকার্য পরিচালনায় ক্রমশ বিমুখ হন সেদিকে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইরূপ একটি বংশের নাম ছিল সোগা (Soga)। এই বংশ জাপানে বৌদ্বধর্ম প্রচারে যুবরাজ শোতোকু তাইশি-কে (Shotoku Taishi) সমর্থন করে এবং ফলে যুবরাজের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। যুবরাজ হলেও প্রকৃত পক্ষে শোতোকুই দেশ শাসন করতেন। তাঁর আত্মীয়া সম্রাজ্ঞী সুইকো (Empress Suiko) নাম-মাত্র রাজত্ব করতেন। ৬২১ খ্রীষ্টব্দে শোতোকুর মৃত্যু হলে সোগা বংশ রাজক্ষমতা অধিকারে সচেষ্ট হয়, কিন্তু অপর একটি ক্ষমতালোলুপ বংশের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে অবৈধভাবে রাজক্ষমতা অধিকারে প্রয়াস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ক্ষমতা দখলের আসরে এই প্রতিদন্দ্বী বংশের নাম ফুজিয়ারা (Fujiwara)। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে এই বংশের নেতৃত্ব দেন ফুজিয়ারা কামাতারি (Fujiwara Kamatari)। প্রাক্-মেজি যুগে জাপান ইতিহাসে কামাতারি একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক এবং চৈনিক সভ্যতাও শাসনতন্ত্রের গুণগ্রহী। চীনের কেন্দ্রীয় শাসন প্রণালীর আদর্শে তিনি জাপানেও অনুরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করেন। প্রায় চারশত বৎসর ব্যাপী এই শাসন-ব্যবস্থা চালু থাকে, যদিও মাঝে মধ্যে তার কিছুটা সংশোধিত হয়। এই দীর্ঘকাল জাপানের প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে কামাতারির বংশধরদের হাতে। রাজবংশের বাহিরে এই ফুজিয়ারা বংশই তখন ছিল সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ফুজিয়ারা বংশের আধিপত্য কালে খ্রীষ্টজন্মের অষ্টম শতকের গোড়ার দিকে বৌদ্ধ-প্রধান নারা নগরে রাজধানী স্থাপিত হয়। পরে, ৭৯৪ খ্রীষ্টব্দে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় হেইয়ানান-ক্যো (Heinan-keyo) শহরে, যা বর্তমানে কিয়োটো নামে পরিচিত। তখন জাপানের সম্রাট ছিলেন কাম্মু

Dhaka University Institutional Repository

(Kammu) তাঁর রাজত্বকাল বিস্তৃত ছিল ৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (যখন হেইয়ান-ক্যো শহরে রাজধানী স্থাপিত হয়) ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পযর্ন্ত যে সময় কাল তা জাপানের ইতিহাসে হেইয়ানান যুগ (Heian Period) নামে পরিচিত। এই যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, সেকালে জাপানে প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা সম্রাটের হাত থেকে ফুজিয়ারা বংশের অধিকারে আসে। ফলে, একদিকে যেমন সম্রাট ক্রমশঃ ক্ষমতাবিহীন রাষ্টপ্রধানে পরিণত হন, অন্যদিকে তেমনি ফুজিয়ারা বংশের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্টিত হয়। হেইয়ান যুগ ফুজিয়ারা বংশের উত্থান ও পতন উভয়েরই সাক্ষীস্বরূপ। ফুজিয়ারা বংশের পতনে মিনামোটো (Minamooto) বংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে [১০]।

ফুজিয়ারা বংশের ক্ষমতাচ্যুতির কারণগুলি কি? ফুজিয়ারা বংশ রাজবংশের মত দৈব উৎপত্তির দাবি করত। সেই সুবাদে ফুজিয়ারা বংশ রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সচেষ্ঠ হয়। এই বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছিল ফুজিয়ারা নেতাদের হাতে রাজবংশের উপর প্রত্যক্ষ অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কৌশল। কোন ফুজিয়ারা নেতাদের হাতে রাজবংশের উপর প্রত্যক্ষ অধিকার প্রতিষ্ঠা অন্যতম প্রধান কৌশল। কোন ফুজিয়ারা নেতার ভাবী উত্তরাধিকারিণী কন্যাসন্তান বিবাহযোগ্য হলে বিবাহ দেওয়া হত তৎকালীন সম্রাটের সঙ্গে, যিনি স্বভাবিক কারণেই তরুণ বয়স্ক হতেন। তাঁদের প্রথম পুত্রসন্তানের জন্মের পর পুত্রটি নাবালক থাক কালেই সম্রাটকে তার অনুকূলে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। সম্রাটের পদত্যাগের বয়স গড়ে ৩১ বৎসর। সম্রাট পদত্যাগ করলেই বা পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেই নাবালক পুত্রটি উত্তরাধিকারসূত্রে রাজমুকুট ধারণ করতেন এবং তিনি প্রতিনিধিস্বরূপ নিযুক্ত হতেন ফুজিয়ারা বংশজ অগ্রগণ্য নেতা। এইভাবে শুধুমাত্র সিংহাসনে আরোহণ ব্যতীত আর সকল রকম রাজকীয় অধিকার ও ক্ষমতার অধিকারী হত ফুজিয়ারা বংশ।

Dhaka University Institutional Repository

নাবালক সম্রাট সাবালকত্ব অর্জন ক'রে প্রায় ৩১ বৎসর বয়স্ক হলেই তাঁকেও একই পদ্ধতিতে রাজপদ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হত। এইভাবে অক্ষুন্ন থাকত সিংহাসনের উপর ফুজিয়ারা বংশের প্রভাব। এতদ্ব্যতীত রাজপ্রসাদের ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে সম্রাট যথা অচিরে অকর্মণ্য ও মেরুদন্ডহীন হয়ে পড়েন সেদিকেও ফুজিয়ারা নেতারা সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। রাজপ্রসাদের ভোগবিলাসের দুর্বার মোহ যতই সম্রাটকে আচ্ছন্ন করত দিনের পর দিন, ততই ফুজিয়ারা নেতাদের রাজক্ষমতা গ্রাসের সুবর্ণ সুযোগ ত্বরান্বিত হত। এইভাবে নীতিহীন পন্থা অবলম্বন করে ফুজিয়ারা বংশ জাপানের রাজনীতিতে প্রতিপত্তির চরমশিখরে ওঠে। এইকালে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ-নেতা ছিলেন মিচিনাগা (Michinaga)। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী যে সময়কালে আটজন মাত্র সম্রাট সিংহাসনরূঢ় হন- তিনি ক্ষমতার উচ্চাসনে আসীন থাকেন। অবশেষে ফুজিয়ারা বংশের রাজনৈতিক জীবনে সুদিনের অবসান আসন্ন হয়। রাজধানী কিয়োটেতে ফুজিয়ারা নেতৃবৃন্দের বাসস্থান ছিল প্রাসাদোপম। সেখানে নিজেদের ভোগাবিলাসের সরঞ্জামের কোন অভাব ছিল না। ফলে তাঁরাও ধীরে ধীরে ভোসাসক্ত হয়ে প্রশাসনিক কার্যে ক্রমশঃ শিথিল ও অযোগ্য হয়ে পড়েন। শুরু হয় নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্ধ। ফুজিয়ারা নেতারাই প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত হতেন। কিন্তু এইসব প্রাদেশিক শাসনকর্তা স্ব-স্ব ভার-প্রাপ্ত প্রদেশের প্রধান কর্মকেন্দ্র উপস্থিত না থেকে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই রাজধানীতেই ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করতে পছন্দ করতেন। জীবনধারায় এরুপ প্রবণতার অনিবার্য পরিণতি হয় প্রদেশে অরাজকতা সৃষ্টি, রাজস্ব অনাদায় এবং ঘাটতি বাজেট। উপরন্তু প্রাদেশিক শাসনভার ফুজিয়ারাবংশ-বহির্ভূত স্থানীয় নেতাদের অধিকারভূক্ত হয়, যাঁরা সুযোগ বুঝে বহু ভূ-সম্পত্তি জবরদখল করেন। এই সব নিস্কর জমির মালিকেরাই পরবর্তীকালে ডইমিয়ো (Daimyo) বা জমিদার নামে পরিচিত হন। কালক্রমে তাঁদের সম্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাঁরা যুদ্ধ-নিপুন অনুচর নিয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

করতে থাকেন। এইভাবে গঠিত হয় সামন্ত সৈন্য (Feudal amy) । নিষ্কর সম্পত্তির জবরদখলকারী এই সব জামিদার দুটি গোষ্ঠীভূক্ত ছিলেন, যথা টেইরা (Taira) এবং মিনামোটো (Minamoto) । মিনামেটো গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ ছিল বর্তমান টোকিওর সন্নিকটস্থ কান্টো (**Kanto**) অঞ্চলে, আর টেইরার আধিপত্য ছিল Inland Sea এর উপকুলবর্তী প্রদেশসমূহে। ফুজিয়ারা নেতৃবৃন্দ তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় উক্ত দুটি সামরিক শক্তিসম্পন্ন জমিদারগোষ্ঠী থেকে সামরিক সাহায্য পান। ফুজিয়ারা নেতাদের এই অর্ন্তদ্বন্দ যখন রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে পরিণত হয় তখন তাঁরা টেইরা ও মিনামোটোর জমিদারদের সামরিক সাহায্যের উপর পূর্বাপেক্ষা অধিক নির্ভারশীল হন। ফুজিয়ারা বংশীয় বিবদমান শিবির-ভূক্ত নেতাদের গৃহযুদ্ধ উভয় পক্ষকেই সর্বস্বান্ত করে। ফলে দেশের প্রকৃত শাসনভার টেইরা গোষ্ঠীর অধিকারভূক্ত হয়। এইভাবে ফুজিয়ারা বংশের রাজনৈতিক আধিপত্যের অবসান ঘটে।

নেমিসিসে'র (Nemesis) বা প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্র দেবীর হাত থেকে ফুজিয়ারা বংশ শেষ অবধি নিস্কৃতি পায় না। টেইরা গোষ্ঠীর এক্ছত্র আধিপত্য অবশ্য, দীর্ঘস্থানীয় হয়নি, বিপক্ষ মিনামেটো গোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দিতার ফলে শুরু হয় টেইরা ও মিনামোটোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্ধ। কান্টোতে শুরু হয় এই যুদ্ধ বিস্তৃত হয় মধ্য পশ্চিম জাপানে। অবশেষে ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শিমোনোসেকি প্রণালীকে (Shimonoseki Starats) ডান-নো-উরা-য় (Da-no-ura) এক জলযুদ্ধে মিনামোটো গোষ্ঠী জোরিটোমা-র (Ynitomo) নেতৃত্বে টেরিাকে সম্পুর্ণরূপে পরাভূত করে স্বীয় আধপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। তখন সম্রাট ছিলেন নাবালক আনতোকু (Antoku)। যুদ্ধ চলাকালীন টেইরা নৌবাহিনী তাঁকে বলপ্রয়োগে যুদ্ধস্থলে নিয়ে গেলে জলমগ্ন হয়ে তার মৃত্যু হয়। ডান-নো-উরার যুদ্ধ সাফল্যের

Dhaka University Institutional Repository

পর জোরিটোমো দেশের কার্যতঃ প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে স্বীকৃত হন। তাঁর কর্ম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় কামাকুরা-তে (Kamakura) যেখানে তিনি তাঁর সামরিক শাসন প্রবর্তিত করেন। এই শাসনই পরিচিত হয় বাকুফু নামে (Bakuf)। কথিত আছে, মিনামোটো গোষ্ঠী যাঁর নেতৃত্বে ডান-নো-উরা-র যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি প্রকৃতপক্ষে জোরিটোমো ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর অনুজ য়োসিৎশুন (Yoshitsune)। য়োসিৎশুনে জাপানের ইতিহাস একটি বিশিষ্ট চরিত্র। পরে তিনি জোরিটোমের অনুচরবর্গের হাতে প্রাণ হারান। টেইরা-মিনামোটের পাঁচ বৎসর ব্যাপী গৃহযুদ্ধ জাপানি মানসপটে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এই গৃহযুদ্ধের কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয় বহু উপাখ্যান এবং রঙ্গমঞ্চে অভিনয়যোগ্য নাটক। এই যুদ্ধচলাকালীনই সর্বপ্রথম সামুরাই শ্রেণীর উদ্ভব হয় [১১]।

ডান-নো-উরার যুদ্ধের পর কামাকুরা বাকুফুর অধিনায়ক মিনামোটো জোরিটোমো সম্রাটের কাছ থেকে এক নতুন খেতাব পাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পিত খেতাবের নাম শোগুন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন ত্রয়োদশ বর্ষী সম্রাট গো-টোবা মিনামোটা জোরিটোমের অনুরোধ তাঁকে শোগুন উপাধিতে ভূষিত করেন। শোগুন অর্থে সম্রাটের অধীন প্রধান সেনাপতি বা সামরিক অধিনায়ক (Generalissimo)। এইভাবে শুরু হয় শোগুন যুগ, যার স্থায়িত্বকাল ছিল ১১৯২ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মিনামোটো জোরিটোমো সর্বপ্রথম শোগুন, আর শোগুন যুগের অবসান ঘটে শোগুন যোশিনোবুর পদত্যাগের সঙ্গে। ১২আগষ্ট ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্লাইভের নেতৃত্বে যেমন অনায়াসে সমসাময়িক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করেছিলেন, তেমনি সহজ অথবা সহজতর পন্থায় মিনামোটো জোরিটোমা জাপানি সম্রাট গোটোবাকে প্রভাবান্বিত ক'রে শোগুন উপাধি

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করে নেন। সুচিত হয় দ্বৈতশাসন (Double or Dual Governemnt) কিয়োটোতে সম্রাটের বেসামরিক শাসন, আর কামাকুরায় (পরে এডোতে) শোগুনের সামরিক শাসন। আইনত সম্রাট হন কায়া এবং শোগুন ছায়া। কিন্তু কার্যরতঃ সম্রাট হন ছায়া এবং শোগুন কায়া।

কিয়োটোতে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বয়ং সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে গঠিত সরকার আর কামাকুরায় শোগুন কর্তৃক গঠিত হয় সম্রাট-বিরোধী সরকার, যেমন ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস তথা ভারতের মারঠা ইতিহাস নজির পাওয়া যায় 'ডি ফ্যাক্টো' সরকারের যুগপৎ অস্তিত্বের। ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস এক দিকে ছিল মেরোভিঞ্জিয়ান রাজপদ (ডি জুরি), অপরদিকে কোরোলিঞ্জিয়ান মেয়র অব প্যালেস' (ডি ফ্যাক্ট) অথবা ভারতের মারাঠা ইতিহাসে একদিকে ছিল মারঠা ছত্রপতি (ডি জুরে), অপরদিকে মারাঠা পেশোয়া (ডি ফ্যাক্টো)।

টোকুগাওয়া যুগ

টোকুগাওয়া যুগে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাকুফু, মতান্তরে বাকুফু হান (Bakufu Han) নামে পরিচিত ছিল। বাকুফু শব্দের অর্থ শোগুনের সামরিক শাসন-ব্যবস্থা, আর হান শব্দের অর্থ ডাইমিয়োর জমিদারী (ফিউডাল ডোমেন)। টোকুগাওয়া যুগে শোগুন তথা ডাইমিয়ো উভয়ই বিদ্যমান থাকায় টোকুগাওয়া যুগের শাসন-ব্যবস্থাকে বাকুফু হান আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

টোকুগাওয়া যুগে শাসন-ব্যবস্থার শীর্ষস্থান ছিলেন মির্কাডো বা সম্রাট। সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রতীক। তাঁর নামেই দেশ শাসিত হত। তবে, দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে শোগুনের আবির্ভাবের পূর্বে সম্রাট যেমন তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যতঃ উভয়দিকে থেকেই শাসনক্ষেত্রে সর্বেসর্বা ছিলেন, শোগুন-শাসন প্রতিষ্ঠিত

Dhaka University Institutional Repository

হবার পর, বিশেষতঃ টোকুগাওয়া-বংশীয় শোগুনের শাসন-ক্ষমতা প্রাপ্তির পর, সম্রাট আর কার্যতঃ প্রশাসনিক প্রধান থাকেন না। সম্রাট প্রধান থাকেন কেবল তত্ত্বগতভাবে, আর কার্যতঃ প্রধান প্রশাসনিক দায়িত্ব পান শোগুন। একটি অট্টালিকায় পোর্টিকোর (শোভাবর্ধক বারান্দা) যে প্রয়োজন অথবা একটি চার-চক্র বিশিষ্ট গাড়ীতে পঞ্চম চক্রের যে সার্থকতা, শোগুন শাসনপ্রণালীতে সম্রাটেরও ছিল প্রায় অনুরুপ প্রয়োজন ও সার্থকতা অর্থাৎ শোগুন শাসনব্যবস্থায় সম্রাট পরিণত হন একটি ক্ষমতাবিহীন শোভাবর্ধক অঙ্গমাত্র। সম্রাট প্রশাসনিক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হলেও জাপানি জাতির শ্রদ্ধা ও সম্মান থকে বঞ্চিত হননি। 'সূর্যদেবীর' বংশোদ্ভুত সম্রাটের আসন ছিল জাপানি জাতির অন্তরের মণিকোঠায়। টোকুগাওয়া শোগুনেরাও তাঁদের শাসনকালের গোড়ার দিকে সম্রাটকে একেবারে অবহেলা না করে তাঁর কাছে তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তাদির অনুমোদন প্রার্থনা করতেন। সম্রাটও স্বীয় অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করে আর্থিক অনুমোদন দানে কদাচিৎ অসম্মত হতেন না। কালক্রমে টোকুগাওয়া শোগুনেরা সম্রাটের সঙ্গে কোনও পরামর্শ না করেই প্রাশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাঁদের শাসনব্যবস্থায় সম্রাটকে কিয়োটো রাজপ্রসাদে বন্দী-জীবন যাপন করতে হয়। সম্রাটের রাজপ্রসাদের বাহিরে আসা কিংবা কাহারও পক্ষে রাজপ্রসাদে সম্রাটের দর্শন পাওয়া ছিল শোগুন শাসকের অনুমোদন সাপেক্ষ। মারঠা নেতা শাহাজাদি সম্রাটের দর্শন পাওয়া ছিল শোগুন-শাসকের অনুমোদন সাপেক্ষ। মারাঠা নেতা শাহাজাদি সিন্ধিয়ার অধীনে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬) যে মর্যাদাহীন অবস্থা ছিল, প্রায় অনুরুপ অবস্থা ছিল জাপানি সম্রাটের, টোকুগাওয়া শোগুনের শাসনাধীনে।

শোগুন বা সেই-তাই শোগুন (Sei-Tai-Shogun) তাই তাইকুন (Tycoon) ছিলেন দেশের জিম্মু টেন্নো-বংশীয় সম্রাটের শাসনকার্যে দক্ষতার

Dhaka University Institutional Repository

অভাব, ফুজিয়ারা বংশের সম্রাট-বিরোধী চক্রান্ত তথা ফুজিয়ারা শাসনকালে দেশে অরাজকতা এবং রাজনৈতিক ঐক্যের একান্ত অভাব, টেয়ারা-মিনামোটো সংঘর্ষ- সব কিছু মিলিতভাবে দ্বাদশ শতকের শেষ দশকে দেশে এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একটা সুদুর প্রসারী পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। মিনামোটে জোরিটোমোর আবির্ভাব এবং নেতৃত্ব এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে এবং দেশে ঐক্য এবং শান্তিশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শোগুন শাসনের গোড়াপত্তন করে।

মিনামোটো জোরিমোটো এবং তাঁর বংশধরেরা ১১৯২ থেকে ১১৯৯ পর্যন্ত শোগুন হিসাবে দেশ শাসন করেন। তারপর হোজো (Hojo) বংশের হাতে শাসন-ভার অর্পিত হয়। হোজো বংশীয়গণ অবশ্য স্বয়ং শোগুন উপাধি গ্রহণ না করে মিনামোটো জোরিটোমের বংশধরদের প্রতিনিধ (Regernt ev Shikken) হিসাবে প্রাশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন ১১৯৯ থেকে ১৩৩৩ পর্যন্ত। হোজো শাসনকালে মোঘল সম্রাট কুবলাই খান (Kublai Khan) দুই বার জাপান আক্রমণ করেন, প্রথমবার ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয়বার চোখে হেয় প্রতিপন্ন হন। মোঘল আক্রমণের পর হোজোবংশের শাসন কিছুকাল প্রচলিত থাকে। ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন হোজোবংশীয় শোগুন প্রতিনিধি সম্রাট গো-ডাইগো-কে (Go-Diago) সিংহাসনচ্যুত করে নির্বাসিত করেন। সম্রাট গো-ডাইগো শোগুন-শাসন উচ্ছেদ করে প্রাক-শোগুন জাপান সম্রাটের যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল তা পুনরুদ্ধার করতে চান। পরিণামে তিনি ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হন। কিন্তু দুই বৎসর পর তিনি হোজো শিবির থেকে দলত্যাগীদের সাহায্যে সিংহাসন পুনরধিকার করেন। ফলে শেষ হোজো-প্রতিনিধি স্বপারিবারে এবং প্রায় আটশত অনুচর সহ আত্মহত্যা (হারিকিরি, hara-kiri) করেন। এই ঘটনার স্বল্পকালে মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

মিনামোটো বংশোদ্ভুত নেতা আশিকাগা তাকাউজি (Ashikaga Takauji) গো-ডাইগোকে ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন থেকে অপসারিত করে জিম্যোয়িন (Jimyoin) বংশীয় কোম্যো-কে (Komyo) নূতন সম্রাট হিসাবে বরণ করেন।

আশিকাগা এবং তাঁর বংশধরেরা শোগুন হিসাবে দেশ শাসন করেন ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৭৩ পর্যন্ত। আশিকাগা শোগুনেরা তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন কিয়োটোর অন্তর্গত মুরোমাচি (Muromachi) জেলায়। এই কারণে তাঁদের শাসনকাল মুরোমাচি যুগ নামে পরিচিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও এই যুগে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে তথা শিল্পকলারও বিকাশ ঘটে। আশিকাগা শোগুনদের মধ্যে য়োশিমিৎসু (Yoshimistsu,) এবং য়োশিমিৎসু (Yoshimistsu,) সৌন্দর্য-বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আশিকাগা শাসনের শেষের দিকে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা অবনতি ঘটে এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্যেরও অভাব দেখা যায়। শান্তি-শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই সময় তিনজন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সামরিক নেতার আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হলেন ওডা নোবুনাগা (Oda Nobunaga,), টোয়োটোমি হিডেয়োশি (Toyotomi Hideyoshi,) এবং টোকুগাওয়া ইয়েযোসু (Tokugawa leyaš,)। এই তিন নেতার সম্পর্কে কথিত আছে যে নোবুনাগা প্রস্তরখানি থেকে প্রস্তর উত্তোলন করেন, হিডোয়োশি উত্তোলিত প্রস্তরগুলিকে আকৃতিবিশিষ্ট করেন এবং ইয়েযুসু সেগুলিকে যথাস্থানে স্থাপন করেন। এইভাবে নোবুনাগা ও হিডোয়োশীর আরব্ধ কার্য ইয়েযোসুর হস্তে সম্পুর্ণতা লাভ করে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং কার্যসিদ্ধির পদ্ধতিতে কিন্তু তাঁরা ছিলেন বৈসাদৃশ্য। জাপানিদের মধ্যে এ বৈসাদৃশ্য-সূচক একটি সুবিদিত গল্প প্রচলিত আছে। একদা

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত নেতা তিনজন একটি পাখী দেখতে পেয়ে তার গান শুনতে আগ্রহী হন। পাখীটি গান গাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করায় নোবুনাগা উত্তোজিত হয়ে পাখীটিকে নিহত করবার সঙ্কল্প করেন, হিডোয়োশি জেদ ধরেন যে পাখীটিকে গান শোনেতেই হবে এবং ইয়েযোসু স্থির করেন যে পাখীটি গান না গাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবেন। তিন জনই ছিলেন ডাইমিয়ো শ্রেণীভূক্ত। নোবুনাগা তাঁর হঠকারিতার জন্য তাঁরই এক সমর্থক কর্তৃক নিহত হন। হিডোয়োশির জেদের বশে কোরিয়া আক্রমণ তাঁর অকালমৃত্যুর কারণ হয়। ইয়েযোসুর ধৈর্য তাঁকে টোকুগাওয়া শোগুন শাসনে স্থাপয়িতার গৌরব দান করে। তিনজনই সামরিক আধিপত্য স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। নাবুনাগা ১৫৭৩ খ্রীষ্টব্দে আশিকাগা শোগুন য়োশিয়াকি-কে (Yoshiaki) কিয়োটো থেকে অপসারিত করে আশিকাগা শোগুন-শাসনের অবসান ঘটান এবং কিয়োটোতে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠত করেন। তিনি কিন্তু শোগুন উপাধী গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ ইতিমধ্যে অনুমোদিত প্রথম অনুযায়ী শোগুন উপাধিকে মিনামোটো বংশোদ্ভুত হতে হবে অথচ নোবুনাগা ছিলেন টেয়ারা বংশজাত। নোবুনাগা ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে এক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি কর্তৃক নিহত হন। তখন তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি হিডোয়োশি সর্বসময় কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ পান। দেশে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ডাইমিয়ো শ্রেণীকে স্বীয় অধীনে আনতে অগ্রসর হন। তখন জাপানে নয়টি প্রধান প্রধান ডাইমিয়ো সংগঠন ছিল, যথা হোজো (Hojo), টাকেডা (Takeda), উয়েসুগি (Uesugi), টোকুগাওয়া (Tokugawa), মোরি (Mori), চোসোকাবে (Chosokabe), ওটোমো (otomo), রুজোজি (Ryuzoji) এবং শিমাজু (Shimazu)। এদের মধ্যে উয়েসুগি, টোকুগাওয়া এবং মোরি ডাইমিয়ো শ্রেণীগুলি ছিল হিডোয়োশির মিত্রপক্ষীয়। সুতরাং হিডোয়োশি অবশিষ্ট ছয়টি ডাইমিয়ো গোষ্ঠীর আনুগত্যের স্বীকৃতি আদাযে সচেষ্ট হন। শেষ অবধি তাঁরা সকলেই

Dhaka University Institutional Repository

হিডোয়োশির আধিপত্য স্বীকার করেন। ফলে হিডোয়োশির নেতৃত্বে দেশে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং দেশের সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়। সম্রাট যথারীতি সিংহাসন আরোহন থাকেন এবং সম্রাটের নামেই হিডোয়োশি প্রশাসনিক কার্য পরিচালনা করেন। তিনি নোবুনাগর মত স্বয়ং শোগুন উপাধি গ্রহণ করতে পারেননি, যেহেতু তিনিও মিনামোটো বংশোদ্ভুত ছিলেন না। সম্রাট তাঁকে কামপাকু (Kampaku, Civil Director) উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া আক্রমণকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন তাঁর অধীনস্থ সেনাপতি ছিলেন টোকুগাওয়া বংশীয় ইয়েযোসু। তিনি ২১শে অক্টোবর, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে বিপক্ষ দলকে সেকিগাহারা (Sekigahara) যুদ্ধে পরাস্ত করে দেশের শাসনভার সম্পুর্ণরুপে স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন সম্রাট তাঁকে শোগুন উপাধিতে ভূষিত করেন। শুরু হয় টোকুগাওয়া যুগ, যার স্থায়িত্বকাল বিস্তৃত ছিল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রকৃত শাসক জাপানি সম্রাটকে সম্মুখে শিখন্ডীরূপে রেখে শোগুনই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। শোগুনের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত হয় এডাতে (বর্তমান টোকিও)। সেখানে শোগুনের রাজকীয় পরিবেশে প্রশাসনিক সকল ব্যবস্থাই বিদ্যমান ছিল- আড়ম্বরপূর্ণ কোর্ট, বশংবদ পরিষদবর্গ, সশস্ত্র অনুচরবর্গ ইত্যাদি। শোগুন নিজে ছিলেন ডাইমিয়ো শ্রেণীভুক্ত কিন্তু ডাইমিয়ো শ্রেণীর অগ্রণী অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ডাইমিয়ো। প্রথম সারির সর্বপ্রথম ডাইমিয়ো হিসাবে শোগুন জাপানে জমিদারীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ নিজ অধিকারে রেখে অবশিষ্ট অংশ অপর ডাইমিয়োর মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন। শোগুনদের শক্তির ভিত্তি ছিল অর্থনৈতিক তথা সাময়িক। পদাধিকারবলে তিনি ছিলেন দেশের প্রধানতম জমিদার এবং জমি বন্টনে একমাত্র অধিকারী। তাঁর লক্ষ্য ছিল স্থায়ী সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করে বিপক্ষ দলকে আদৌ মাথা তুলতে না দেওয়া। তাঁর অধীন ডাইমিয়োগণকে তাঁর প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

অনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হত, এমন কি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতিও দিতে হত। তথাপি শোগুন তাঁদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন এবং যাতে তাঁরা কখনও বিদ্রোহ ঘোষণা করতে না পারেন সে জন্য উপযুক্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন। বিপক্ষ ডাইমিয়ো শ্রেণী (Tozama) যাতে বিদ্রোহ মুখী না হতে পারেন তজ্জন্য শোগুন কতকগুলি ডাইমিয়ো-দমন সূচক ব্যবস্থা (anti-feudal measures) অবলম্বন করেন: (১) প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী ডাইমিয়োগণ তাঁদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত হন; (২) শক্তিশালী এবং বিদ্রোহপ্রবণ ডাইমিয়োগণের জমি এমনভাবে বণ্টিত হত যাতে তাঁদের পরস্পরের জমিদারী সংলগ্ন না হয়ে বিছিন্নভাবে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এইভাবেই জমিদারী বন্টনের ফলে বিদ্রোহ মনোভাবপন্ন ডাইমিয়োদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের বিভিন্ন জমিদারী বন্টনের ফলে বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন ডাইমিয়োদের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও তাঁদের বিভিন্ন জমিদারী অবস্থানের দূরত্ব হেতু দ্রুত সশস্ত্র অনুচর সংগ্রহ করা সম্ভব হত না কিংবা সমমনোভাবাপন্ন ডাইমিয়োদের পক্ষে জোট বেঁধে দ্রুত সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তোলাও সম্ভবপর হত না: ইতিমধ্যে অতি-সতর্ক শোগুন বিদ্রোহের সম্ভবনাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতেন: (৩) শোগুনের নির্দেশে প্রত্যেক ডাইমিয়োকে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র এডোতে বৎসরের কিছুকাল অতিবাহিত করতে হত, তাঁকে শাসনকার্যে সাহায্য করবার জন্য। ডাইমিয়োদের কাছে শাসনকার্যে সহায়তা পাওয়াছিল শোগুনের গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ডাইমিয়োগণকে বৎসরের বেশ কিছুকাল স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখা। শোগুনের রাজধানীতে অবস্থানকালে ডাইমিয়োগণকে উন্নতমানের জীবনযাপন করতে হত, এমনকি নিজেদের জন্য দুর্গ বা বাসস্থান নির্মাণ করতে হত, যার ফলে অনেক সময় অর্থাভাবে ডাইমিয়োগণ বণিক শ্রেণীর কাছে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। তৎকালীন নিয়ম অনুসারে স্ব-স্ব জমিদারীতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ডায়মিয়োগণকে অনুগত্যের প্রমাণস্বরূপ এডোতে নিজ নিজ বা প্রতিভূ রেখে আসতে হত। কোন ডাইমিয়োর অনুগত্যের অভাব দেখা দিলে শাস্তি পেতেন । ডাইমিয়োদের স্ত্রী-পুত্রেরাই প্রতিভূ হিসাবে গৃহীত হতেন। শোগুন প্রবর্তিত এই বিধানকে

Dhaka University Institutional Repository

বলা হত স্যানকিন কোটাই (Sankin Kotai) বা বিকল্প উপস্থিতি (Altemative attendance); (৪) ডাইমিয়োগণ কার্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন-শোগুনের সমর্থক দল এবং বিপক্ষ দল। সমর্থকেরা অভিহিত ছিলেন ফিউডাই (Fudai) নামে, আর বিপক্ষ দল পরিচিত ছিলেন টোজোমা (Tozama) নামে। এই বিপক্ষ দলের অবস্থান ছিল পশ্চিম জাপানে সাতসুমা, চোষু, টোজা ও হিজেন অঞ্চলে। শোগুন তাঁর সমর্থক ডাইমিয়োগণকে প্রশাসনে উচ্চপদে নিয়োগ করতেন। বিপক্ষদলীয় টোজোমাকে প্রশাসনিক কোন দায়-দায়িত্ব দেওয়া হত না। শোাগুনের নির্দেশ ছিল যে বিপক্ষদলের উইমিয়াগণ পরস্পরের সঙ্গে জোট বাঁধতে পারবে না। শেষ অবধি পশ্চিম জাপানে রাজনৈতিক আলোড়নে শোগুনে সিংহাসন প্রচন্ডভাবে কম্পিত হয় (৫) বিভেদ-নীতি অনুসরণ করে শোগুন ডাইমিয়োদের মধ্যে বংশগত বিরোধ সঞ্জীবিত রাখতে প্রয়াস পেতেন। ফলে বিদ্রোহ-প্রবণ ডাইমিয়োগণ শোগুন-বিরোধী কার্যকলাপে নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন [১২]।

মেজি যুগ (১৮৬৮-১৯১২)

প্রথম পর্যায়ে আধুনিকীকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, অর্থনৈতিক বিবর্তন, মেজি সংবিধান (১৮৮৯), মেজি যুগের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মেজি জাপানে অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে শিল্প শাষিত-বণিক শ্রেণীর (Entrepreneur) অবদান।

শোগুন যুগের অবসানের পর জাপানে যে যুগ শুরু হয় তার নাম মেজি যুগ। মেজি শব্দের অর্থ সভ্যতা এবং জ্ঞানদীপ্তি। শোগুন যুগে জাপানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবধারা প্রবাহিত হয় এক নতুন খাতে, যে জীবনধারা ছিল পাশ্চত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবান্বিত। তাই মেজিযুগের অভ্যুদয়ে জাপানি জীবনে পাশ্চত্য সভ্যতা দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাবান্বিত। তাই মেজিযুগের অভ্যুদয়ে জাপানি জীবনে পাশ্চত্য ছাপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট থেকে সুস্পষ্ট হতে থাকে। জাপানে শুরু হয় প্রথম পর্যায়ের আধুনিকীকরণের যুগ।

মেজিযুগের আবির্ভাবের গোড়ার কথা সম্রাটের পুনর্বাসন ও তাঁর হৃত ক্ষমতার পুনরুদ্ধার। সেই জন্য মেজি যুগ Age of Restoration (Meiji Ishin) নামে অভিহিত। শোগুন যুগে সম্রাটের জন্য নির্দিষ্ট ছিল কিয়োটোর প্রাসাদ, যেখানে তিনি ক্ষমতাহীন অবস্থায় প্রায় বন্দীজীবন যাপন করতেন। শোগুনের বাসস্থান ছিল এডো শহরে, যা ছিল তৎকালীন কর্মমুখর, প্রশাসনিক মুখ্যকেন্দ্র। সম্রাটের প্রশাসনিক সমস্ত ক্ষমতাই শোগুন অপহরণ করে নিজেকে জাপানের মুকুটহীন সম্রাট হিসাবে জাহির করতেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শোগুন শাসনের অবলুপ্তির পর সম্রাটের আসন স্থানান্তরিত হয় এডো প্রাসাদে। অনেকের মতে সম্রাট এখন থেকে তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যত উভয়রূপেই দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে দেশ শাসনে প্রকৃত সম্রাট-সুলভ ভূমিকা গ্রহণ করেন। শোগুন শাসনের অবসানে সম্রাটের রাজধানী কিয়োটো থেকে এডাতে স্থানান্তরিত হওয়ার পর সম্রাটের স্বক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা (Restoration) ঘটেছিল কি না এবং সম্রাট কার্যতঃ স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন কি না, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। হারবার্ট নরম্যানের মতে রেস্টেরেশনের অর্থ হচ্ছে শোগুন যুগের দ্বৈতশাসনের অবলুপ্তি এবং পূর্বাবস্থার অর্থাৎ প্রাক্-শোগুন যুগের অবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। দ্বৈতশাসন বিদ্যমান থাকাকালীন সম্রাট ছিলেন আইনত (de jure) শাসক, কিন্তু কার্যত (de facto) শাসনধিকার ছিল শোগুনের হস্তে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বৈতশাসন অবসানের ফলে শোগুনপদ অবলুপ্ত হয় এবং সম্রাটই আইনত তথা কার্যত উভয়রূপেই দেশ শাসনের অধিকারী হন। সুতরাং নরম্যানের মতে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যথার্থ **Restoration** ঘটে। নরম্যানকে সমর্থন করে ম্যানসম (Sir George Sansom) এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্তনের ফলে সামন্ততন্ত্র অবলুপ্ত হয় এবং সম্রাটের একাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তবে দেশে

Dhaka University Institutional Repository

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় এই পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা চলে না। বেসুরো মত প্রকাশ করেন হেরল্ড ভিনাকা [১৩]।

তিনি বলেন, রেস্টেরেশনের ফলে সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্ষমতা (Personal authority) প্রতিষ্ঠিত হয়নি অর্থাৎ মোঘুন কর্তৃক অপহৃত শাসন-ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে সম্রাটের করায়ত্ব হয়নি। সে ক্ষমতার অধিকারী হন পশ্চিম জাপানের সাতসুমা, চোষু, টোজা হিজেনের নেতৃবৃন্দ। টোকুগাওয়া শোগুনের পরিবর্তে এই সব নেতৃবৃন্দ্র। টোকুগাওয়া শোগুনের পরিবর্তে এই সব নেতৃবৃন্দ সম্রাটের উপেদেষ্টা নিযুক্ত হন। ভিনাককে সমর্থন; করেছেন কুইগলি (QuigleY) টারনার (Turner) এবং লাটুরেট (Latourette)। কুইগলি ও টারনারের মতে রেস্টেরেশনের ফলে সম্রাট ক্ষমতা ফিরে পাননি, ফিরে পান আত্মমর্যাদা । লাটুরেটের মতে রেস্টেরেশনের ফলে সম্রাটের তত্ত্বগত হিসাবে ক্ষমতা ফিরে পান সত্য কিন্তু কার্যত তাঁর ব্যক্তিগত শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, পূর্বে ছিল টোকুগাওয়া শোগুনের শাসন, তৎপরিবর্তন প্রতিষ্ঠিত হয় শোগুন-বিরোধী সাত-চো-টো-হি (সাতসুমা চোষু-টোজা-হিজেন) শাসন। কাজেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সম্রাটের অবস্থা পূর্ববৎ থেকে যায়। Reischaure[১৪] এর মতেরেস্টেরেশন সম্রাটের প্রতক্ষ শাসন ঘোষণা করলেও প্রকৃত শাসনভার তাঁদেরই হাতে ন্যস্ত থেকে যাঁয় ১৮৬৭-৬৮ খ্রীষ্টপাব্দের আন্দোলনের পর মুৎসুহিতো স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণের সুযোগ পেয়েও সে সুযোগ নিতে ভরসা পাননি। তার প্রধান কারণ, তাঁর শাসনকার্যে অনভিজ্ঞতা। প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা-রহিত স্বল্প-বয়স্ক সম্রাটের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে দেশ শাসনের গুরুভার বহন করা সম্ভবপর হয়নি। তাই তাঁকে সাতসুমা ইত্যাদি গোষ্ঠীর নিকট থেকে অপর এক অলিগার্ক গোষ্ঠীর নিকট থেকে অপর এক অলিগার্ক গোষ্ঠীর নিকটে। তবে ইহাও অনস্বীকার্য যে পূর্বসুরীর বন্দীদশা থেকে মুক্ত মুৎসুহিতোর ব্যক্তি স্বাধীনতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। জ্ঞানচিত্তের উপর তাঁর প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। সম্রাটের এডো-স্তিত রাজপ্রসাদ প্রকৃত প্রশাসনিক কেন্দ্র পরিণত হয়। রাজাজ্ঞা, অনুশাসন প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষিত হতে থাকে সেখান থেকেই। সম্রাট আর পূর্বের মত উপেক্ষিত থাকেন নি। তিনি আর পুর্বের মত ক্ষমতা-বিহীন অবস্থায় শুধুমাত্র সিংহাসনের শোভা বর্ধনের জন্য চিহ্নিত হননি। তত্ত্বগতভাবে এবং কার্যত উভয়রূপেই তিনি দেশের অধীশ্বর হিসাবে বরণীয় ও স্বীকৃত হন, যদিও তিনি স্বহস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে ভরসা পাননি। তাই তাঁরই নামে তাঁরই পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনার ভার অর্পিত হয় সাতসুমা ইত্যাদি গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের উপর। তখন উক্ত গোষ্ঠী-চতুষ্টয়ের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন চোষুর কিডো (Kido) এবং ইটো (Ito Hirobumর), সাতসুমার সাইগো (Saigo) এবং ওকুবো (Okubo), টোজার ইতাগকি (Itagaki) এবং হিজোনের ওকুমা (Okuma)। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সব নেতারা যে সরকার গঠন করেন তার নাম হয সাত-টো-হি-তো' সরকার। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য প্রথমত তিনটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। প্রথম বিভাগে প্রধান ছিলেন রাজপরিবারভুক্ত। দ্বিতীয় বিভাগ গঠিত ছিল রাজসভার সদস্য (কুগে) ও ডাইমিয়োদের নিয়ে তৃতীয় বিভাগ গঠিত হয় পাঁচ জন কুগে এবং পনের জন সামুরাই নিয়ে। এই তিন বিভাগের উপর প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দেই শাসন-ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন সাধিত হয, যখন উক্ত তিনটি বিভাগের ক্ষমতা অর্পিত হয় দুই কক্ষ সম্বলিত একটি আইনসভার উপরর (Daijokwan)। এই কক্ষ দুটি ছিল কাউন্সিল অব স্টেট এবং এসেম্বলি। এই দুই কক্ষের মধ্যে প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পিত হয় কাউন্সিলের উপর।

একই বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাসন-সংক্রান্ত একটি শপথ গ্রহণ করেন। এই শপথ ঘোষিত হয় একটি সনদের আকারে (Charter Oath of Five Articles)। সনদের অনুচ্ছেদগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যথা (১) দেশের বিস্তৃত অঞ্চল থেকে জনপ্রতিনিধি আহ্বান করে একটি আইন সভা গঠিত হবে এবং নিরপেক্ষ আলোচনার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমে শাসন বিষয়ক সকল সিদ্ধান্ত গৃহতি হবে; (২) শাসক ও শাসিত উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতায় শাসনকার্য পরিচালিত হবে (৩) সকল শ্রেণীর নাগরিক- সরকারী কর্মচারী, সেনাবাহিনী ও জনসাধরণ যাতে শ্রমবিমুখ এবং অসন্তুষ্ট না হয় তজ্জন্য তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আকাংক্ষা পূরণের আশা দান করতে হবে; (৪) অতীতের কুরুচির পরিচয়ক রীতিসমূহ বর্জিত হবে এবং সকলের আচরণ ন্যায় ও নৈতিক ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হবে; (৫) জাপান সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর সকল দেশ থেকে জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয় অন্বেষণ করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক শাসনোত্তর আধুনিক জাপান

মধ্যযুগ বা বাকুফু যুগের অবসানে জাপান যখন সর্বপ্রথম আধুনিক যুগ বা মেজি যুগে প্রবেশ করে তখন জাপানের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে। প্রায় ২০০ বৎসর বা তারও অধিক কাল (১৬৩৮-১৮৫৪) বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর জাপান পশ্চিমমুখী হয় [১৫]। ফলে জাপানি জীবনধারা, শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতির উপর ক্রমশ পশ্চিমী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ক্রমশ জাপান সম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। জাপান ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে এবং বিংশ শতকের গোড়ায় চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। চীন-জাপান প্রথম যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫) এবং রুশ-জাপান যুদ্ধে (১৯০৪-০৫) জয়লাভের ফলে জাপানের সাম্রাজ্যবাদিতার নেশা বৃদ্ধি পায়। ৯০ এর দশকে ঘরে বাহিরে অনেক অভিজ্ঞ নেতারই জাপানের অগ্রগতিতে এরূপ ধারণা হয় যে শেষ অবধি জাপান বিশ্ব ইতিহাসের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করেছে। Okuma Shiegenobu প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধান্তে মন্তব্য করেন যে জাপান আর শুধু জাপানের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয় জাপান এখন জাপানী সীমারেখা অতিক্রম করে তার প্রভাব সমগ্র বিশ্বে বিস্তার করতে অধীর আগ্রহী। ফল রুশ-জাপান যুদ্ধোন্তে মন্তব্য করেন যে জাপান শুধু জাপানের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয়, জাপান এখন জাপানি সীমারেখা অতিক্রম করে তার প্রভা সমগ্র বিশ্বে বিস্তার করতে অধীর আগ্রহ।

Dhaka University Institutional Repository

ফলত রুশ-জাপান যুদ্ধোত্তর কালে জাপান ফরমোজা (taiwan) চীন, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াতে প্রভাব বিস্তারে আগ্রণী হয়, চীন সরকারের কাছে ২১ দফা দাবি সম্বলিত একটি দলিল প্রেরণ করে। দাবিগুলির অধিকাংশই চীনা সরকার ক্ষুব্ধ মনে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আপাত দৃষ্টিতে জাপানের জয় সূচিত হলেও জাপান-বিরোধ শক্তিসমূহের, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের, ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠে তার প্রমাণ মেলে ওয়াশিংটন সম্মেলনে (১৯২১-২২)। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্টের কাছে জাপানের নীতি স্বীকার ছিল নিতান্ত সাময়িক। মাত্র দশ বৎসর পর, ১৯৩১ খ্রীষ্টব্দে জাপান ওয়াশিংটন সম্মেলনে আরোপিত সকল বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং মাঞ্চুকুয়ো নামে মাঞ্চুরিয়া অধিগ্রহণ করে। জাপানের কাছে **Mukden** এর পতন ও মাঞ্চুরিয়া জয় ছিল এক রকম blood less victory। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদিতার নেশা জাপানকে যুক্তরাস্ট্রের সঙ্গে জীবন-মরণ সংঘর্ষে লিপ্ত করে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান দ্বিতীয়বার চীন আক্রমণ করে। যুক্তরাষ্ট্র চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের স্বপক্ষে অংশগ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ফলে দ্বিতীয় চীন-জাপান যুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। জাপান শোচনীয়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পরাজিত হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ শে এপ্রিল অবধি জাপান যুক্তরাষ্ট্রর সামরিক শাসনাধীনে থাকে। তারপর জাপানের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির পর জাপানের পুনরায় ক্রমোন্নতি ঘটে।

বিংশ শতকের শেষের দিকে জাপানের অর্থনীতিতে পুনর্গঠন এবং ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির হার ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। ১৯৯২-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে প্রকৃত বিকাশের হার (Real grrowth rate) পরিকল্পিত হয় ৩.৫ শতাংশ আর সাধারণ আর্থিক বিকাশের হার (Normal Growth rate), ৫ শতাংশ। (Statesman year book ১৯৯৫-৯৬, **page** ৮২১) অব্যাহত সমৃদ্ধি এবং উচ্চমানের বৃদ্ধির হার বশত জাপানের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। উন্নতমানের শস্য রোপণে ও আধুনিক

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ-কৌশলের ফলে জাপানি কৃষিতে অভূতর্পূব উন্নতি লক্ষিত হয়। চাউল জাপানিদের প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য হওয়ায় ধান চাষের উপর গুরুত্ব আলোপ করা হয়। আলু, চিনি, বীট, ইক্ষু এবং হরেক রকমের ফল উৎপাদিত হয়।

টোকুগাওয়া শোগুনতন্ত্রের শেষ দশকে শোগুনতন্ত্রের সমর্থক ও মেইজী পুনর্বাসনের নেতাদের কর্মপরিকল্পনার মধ্যে আশ্চার্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে শোগুনতন্ত্র এমন অনেকগুলি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে তাঁর পরিবততর্তে কাউন্সিল অফ গ্রেট লর্ডস স্থাপনের চিন্তা ভাবনা। এগুলি শোগানের তরফেই প্রথমস্তর হয়, পরে বিক্ষুব্ধরা এই মর্মে দাবী তোলে। বড় শহরের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রশাসনিক প্রয়োজনে ছাঁটাই ও বিভিন্ন স্থায়ী অঞ্চলগুলি পুনর্নির্ধান এই ধারনায় ও অনেকক্ষেত্রে গুজবের সৃষ্টি করে যে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা তৈরীর চেষ্টা চলছে। মেজী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে সামন্ত প্রভুদের রেজিস্টার হস্তান্তর (১৮৬৯) এবং প্রিফেকচারস নিয়োগের (১৮৭১) পর থেকে মেজী সমর্থক ও শোগানতন্ত্রের সমর্থক উভয়ের কাছেই এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে 'হানব্যবস্থার' (অর্থাৎ সম্প্রদায়ভিত্তিক সামন্ততন্ত্রের) অবসান ও একটি কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন অনিবার্য। এই অবস্থায় শ্রেণী গোষ্ঠী নির্বিশেষে শেষ পর্যন্ত সবাই মেজী শাসনতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে সম্মত হয়েছিল।

মেজী পুনর্বাসনের পেছনে বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর কি ভূমিকা ছিল তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও, অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে সহমত পোষণ করেন যে মেজী পুনর্বাসনের পরে যারা তার সুফল সবচেয়ে বেশী ভোগ করেছিল তারা অধিকাংশই হল মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের সামুরাই শ্রেণী।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য উৎস

১.Kodansha Intertional ,Tokyo-2002.

The japan book.
Page no-12.

২ .Kodansha Intertional ,Tokyo-2002.

The japan book.
Page no-15

৩ .Kodansha Intertional ,Tokyo-2002.

The japan book.
Page no-17

৪.জাপান ফাউন্ডেশন, টোকিও-২০০০, শিন নিহোনগো কিছো

পৃষ্ঠা -৮

15.tokyo,Japan

Nihongo de manabu nihonjijo.
Page no-15

৬.Kodansha Intertional ,Tokyo-2002. The japan book.

Page-14-15

৭. Kodansha Intertional ,Tokyo-2002. The japan book

Page-15

Dhaka University Institutional Repository

8. .G.B Sanson,Japan.
A short Cultural History
Page no-20

৯. ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -৪

১০. ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস ,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -৯

১১.ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -৮৭

১২.আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস

ড.সিদ্ধার্থ গুহ রায়

পৃষ্ঠা-২৬০

১৩.ভিনাক

পৃষ্ঠা -১৮০

১৪. ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -১৪২

Dhaka University Institutional Repository

১৫. ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -১২৭

১৬. ড.সিদ্ধার্থ গুহ রায়,আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৯৬,

পৃষ্ঠা -২১৬

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাপানী সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

Dhaka University Institutional Repository

জাপানী সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মোঘল শাসনের অবসানের সঙ্গে জাপানে মধ্যযুগের অবলুপ্তি ঘটে এবং শুরু হয় আধুনিক যুগ, যার অপর নাম মেজি যুগ। মেজি সম্রাট মুৎসুহিতো ও মেজি নেতৃবৃন্দ জাপানকে সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালী করে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সমক্ষমতা অর্জনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহন করেন এবং জাপানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পশ্চিমী ধাচে আধুনিকতা সূচক ব্যবস্থাদি প্রবর্তনে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয় [১]।

সামাজিক ক্ষেত্র

পশ্চিমী সভ্যতায় দীক্ষা গ্রহনের পূর্বে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রে যেমন, জাপানেও তেমনি একান্নবর্তী পরিবার ছিল সামাজিক ভিত্তি। এ সময় পরিবারে গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী এবং নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে একত্র সৌহার্দের সাথে বসবাস করত, গুরুজনদের নির্দেশ মান্য করা হত এবং সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে শান্তি বজায় থাকত।

পশ্চিমী সভ্যতার সংস্পর্শে আসার পর পরিবারের গঠন ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন দেখা দেয় এ সময় পিতা-মাতা সন্তানাদি নিয়ে ছোট পরিবার গঠিত হয় শহরে ও শিল্প ভিত্তিক জীবন ধারা পরিবারিক রক্ষনশীলতায় চিড় ধরালো। এছাড়া জীবনের সর্বস্তরে নিজের মতে চলবার দাবি জাপানি সমাজে অগ্রাধিকার পেল [২]।

গ্রাম্য সমাজ

শিল্প-ভিত্তিক জীবন ধারার প্রভাব পড়ল জাপানি সমাজের উপর। ফলে বিংশ শতাব্দির শুরুতেই জাপানি সমাজ আর নিছক পল্লীকেন্দ্রিক অকাল না রেলপথ নির্মানের ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে সংযোগ সহজ হওয়ায় গ্রাম্য জীবন তার স্বকীয়তা হারাল।

Dhaka University Institutional Repository

মেজি পুনর্গমন কালে জাপানে আবাদী জমির ২৫-৩০ শতাংশ চাষ করত প্রজারা স্বয়ং এই অনুপাত ১৯০৮ সালে বৃদ্ধি পায় ৪৫ শতাংশ ১৯৪১ সালে হয় ৪৬ শতাংশ [৩]।

চাষী পরিবারে ২০ শতাংশ নিছক প্রথা হিসাবে জমি আবাদ করত। ৩৫ শতাংশ ছিল আংশিক মালিক এবং আংশিক প্রজা এবং অবশিষ্ট ৪৫ শতাংশ ছিল জমির ষোল আনা মালিক এইসব জমির মালিকের ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বিশেষ। জমির পরিমানের তুলনায় প্রজাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। ফলে প্রজাদের নির্ভর করে থাকতে হত জমিদারদের কৃপা মহানুভূতির উপর যার ফলে জমিদারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এতে গ্রাম্য সমাজে বিশেষ রকম অসামাঞ্জস্য দেখা দেয়। মেজি যুগের গোড়ার দিকে জমির উপর ধার্য সরকারী কর ছিল উৎপন্ন শস্যের মূল্যের উপর ৩৫ শতাংশ। যা ১৯০২ সালে হ্রাস পায় ২০ শতাংশ অথচ জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতো উৎপন্ন শস্যের ৫০ শতাংশ। গ্রাম্য সমাজে জাপানী মানুষের বসবাস অনেকটা কমে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে ছুটে যাচ্ছে টোকিও শহরে। এখন টোকিও পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল শহর।

শহুরে জীবন

১৯৩০ এর মাঝামাঝি ৬৯ মিলিয়ন জাপানি জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশেরও অধিক শহরবাসী ছিল। টোকিও ওয়াশা, কিয়োটো, নাগোয়া, ইউকোহামা, পূর্বে প্রকৃতি শহর ক্রমশ জনবহুল হয়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে অনেকেই প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করে শহরে বসতি স্থাপন করে এবং ভোগ বিলাসে জীবন যাপন করে। ফলে ক্রমশ সুরাপান, ধুমপান, জনপ্রিয় হয় সুরাবিক্রয় কেন্দ্র, রেঁস্তোরা, সিনেমা, নাচঘর, গান সরাই খানা, গ্রামোফোন কোম্পানি প্রভৃতি ভোগ বিলাসের উপকরনের প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন শহরে পরিবেশ কলকারখানা সরকারী দপ্তরখানা, ব্যাংক, রাজনৈতিক দলের কর্মস্থল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের জীবন অনেকাংশ পার্থক্য পাশ্চাত্য ধাচের নির্দিষ্ট সময়ের শয্যাত্যাগ, অতি সত্বর প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করে বাস বা ট্রেনে স্ব স্ব কর্মস্থলের উপস্থিত হয়ে কর্মে যোগদান, প্রাত্যহিক কর্ম শেষে আপন আপন গৃহে প্রত্যাগমন। উক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে যারা উচ্চ পর্যায় বা পদস্থ কর্মচারী ছিলেন তারা মনোনিত হতেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্য হতে।

জনজীবনে পরিবর্তন

আধুনিকীকরণের প্রভাবে জাপানে জনজীবনে পরিবর্তন হয় অনিবার্য। জাপানিরা ব্যবহার করতে শিখল পূর্বে ব্যবহৃত স্যান্ডেলের পরিবর্তে পশ্চিমী পাদুকা ,দেহে কিমোনোর বদলে পশ্চিমী পোষাক পরিচ্ছেদ, গৃহশয্যায় ব্যবহৃত হল পশ্চিমী আসবাবপত্র। বিদেশী পোষাক মেঝের উপর বসায় অসুবিধা হওয়ার জাপানি স্কুল গুলিতে ব্যবহৃত হল বেঞ্চ। খাদ্য হিসাবে গৃহীত হল মাংস ও দুধ। চালু হল ছুরি, কাটা চামুচের ব্যবহার, বৈদ্যুতিক আলো ও পশ্চিমী ঘড়ির ব্যবহার দেখা দিল ঘরে ঘরে।

সৈনিক হিসাবে মনোনীত হবার পরে তারা স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য শহরে আসে এবং শহরের চাকচিক্যে প্রলুব্ধ হয়। তারপর Barrack এ থাকাকালীন শহরে বিলাস উপকরণের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং গ্রামে প্রত্যাগমণের সময় উগ্র বাসনার সঙ্গে আনে। গ্রাম্যজীবনে এইভাবে পরিবর্তন সূচীত হয়।

সামাজিক পার্থক্য বিলুপ্ত

জাপানি সমাজে এ সময় সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক পার্থক্য দূরীভূত হয়। ফলে সামুরাই শ্রেণী পূর্বের মত আর

Dhaka University Institutional Repository

বিশিষ্ট স্থান পায় না এবং সর্বনিম্ন শ্রেণী (Eta) আর সমাজের চোখে অবহেলিত বা অস্পৃহ্য থাকে না, তাদের পূর্বের যা পৃথক গ্রামে বাস করার আইন নিষিদ্ধ হয়। তবে সমাজের পোশাক ও ধনসম্পত্তি ভিত্তিক পার্থক্য বজায় আছে ।

নারীর সামাজিক মর্যাদা

বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে স্ত্রীশিক্ষা, নারী জাতির জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। খ্রীষ্টান মিশনে নেতৃত্বে নারীজাতির জন্য উন্নতমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় সরকারী উদ্যোগে বালিকাদের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী শিক্ষিকদের শিক্ষার জন্য নরম্যাল ও উচ্চ নরম্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বৎসরগুলিতে স্ত্রীজাতিকে টোকিও-র ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে যে কোন বিষয়ের আলোচনায় যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

এছাড়া স্ত্রীজাতির জন্য ছিল খ্রীষ্টান কলেজ সমূহ এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত বেসামরিক পরিচালিত **Japanese Women University** স্ত্রী জাতির জন্য চিকিৎসা, পেশা, সাংবাদিকতা ও অন্যান্য পেশাদারী কার্যে যোগদানের ও সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রামাঞ্চলের স্বল্পবয়স্কা ও বয়স্কা মেয়েরা কৃষিকাজে সহায়তা করত, রেশমের চাষে সাহায্য করা, চা বাগানে চায়ের পাতা তুলতো এবং বাড়ীতে সূতাকাটা ও বস্ত্র বুনন কাজে হাত লাগাত। শিল্পের ক্ষেত্রে কারখানায় মজুরদের মধ্যে মেয়েরা ছিল ৬০ শতাংশ। তুলার কলের কর্মীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা ছিল ৮০ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ব্যবস্থা

মেজি যুগে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও অবৈতনিক ছিল না। পিতা-মাতাকে বিদ্যালয়ের বেতন, পুস্তকাদি সংগ্রহের ব্যয় বহন করতে হত। ফলে বিদ্যালয়ের ভর্তির সংখ্যায় তুলনায় যে সব ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য উপস্থিত হত তাদের সংখ্যা খুবই কম হত। পরে এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। স্থানীয় সরকার বিদ্যালয় সমূহের ব্যয় ভার বহন করতে থাকে। গরীব ছাত্র-ছাত্রী ব্যতীত অপর সকলের সামান্য বেতন দিতে হত। তারা বই কিনত স্ব-খরচে।

প্রথম চীন-জাপান যুদ্ধের পর জাপানে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ১৯০৮ সালে বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক যোগদানের কাল ৪-৬ বৎসর বর্ধিত করা হয়। ১৯২২ সালে শতকরা ১০০ জনই প্রাথমিক শিক্ষায়তনে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে পাটক্রমে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, অঙ্কন, সংগীত, ক্রীড়া এবং বালিকাদের জন্য সুচিকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ তিন বৎসর কৃষিবিদ্যা, বাণিজ্যিক বিষয় ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

পৃথিবীতে সর্বচ্চো শিক্ষার হার হচ্ছে জাপান। ২য় বিশ্ব যুদ্ধের পর জাপানের শিক্ষা পদ্ধতি আমেরিকার সাদৃশ্য গড়ে তোলা হয়। বাধ্যতামূলক শিক্ষা ৬ বছর থেকে বাড়িয়ে ৯ বসর পর্যন্ত করা হয়। সহ শিক্ষা ব্যবস্থা ও চালু করা হয় কিন্ডারগার্ডেন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে ৬ বৎসর তার পর ৩ বৎসর জুনিয়র হাইস্কুল এবং পরবর্তী ৩ বৎসর সিনিয়ার হাইস্কুল। মোট ১২ বৎসর। আমাদের দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সমকক্ষ। এর পর ২ বৎসর জুনিয়র কলেজে রয়েছে আমাদের দেশের বি.এ (পাস) এর সমমানের। এছাড়া ৪ বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক কোর্স ও পরবর্তী ২ বৎসর স্নাতকোত্তর কোর্স।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ ১২+৪+২, পাথমিক থেকে স্নাতকত্তোর পর্যায়ে ১৮ বৎসরের শিক্ষাকালীন সময়। জাপানী শিশুরা ৬ বৎসর বয়সে বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এর পূর্বে অর্থাৎ ৪ বা ৫ বৎসর বয়সে শিশুরা কিন্ডারগার্ডেনে অধয়ন করে থাকে। কিন্ডারগার্ডেন অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক নয়। কিন্ডারগার্ডেনগুলো ব্যক্তি মালিকানায় বা নগর কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং মাসিক টিউশন ফি দিতে হয়। কিন্ডারগার্ডেন ভর্তির পূর্বে বাবা এবং মা উভয়ই যদি কর্মস্থলে ব্যস্ত থাকেন তবে নিজ এলাকার সমাজ-কল্যাণ বিভাগের পরিচালতি শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রে তাদের শিশুদের সকালে রেখে যেতে পারেন এবং বাবা-মা যে কোন একজন দিনের নির্ধারিত সময়ে সন্তানদের ফেরত নিয়ে যাবেন। বাবা-মা'র মাসিক আয় এর উপর নির্ভর করে পরিচর্যা কেন্দ্রের ফি নির্ধারিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণে কোন প্রকার টিউশন ফি দিতে হয় না। তবে দুপুরে খাবারের জন্য এবং শিক্ষক অভিভবক সমিতির "Parents teacher Association" জন্য শিক্ষার্থীদের ফি প্রদান করতে হয়। ৬ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা কালীন সময়ে পড়ানো হয় জাপানী ভাষা, গণিত, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ, ছবি আঁকা, ক্যালিগ্রাফী, হস্তশিল্প, সংগীত, শরীরচর্চা এবং সাঁতার। সংগীত বা বাদ্যযন্ত্রের ক্লাস ব্যতিত সাধারণত একজন শিক্ষক কে শ্রেণীর সব ক্লাস নিতে হয়। অর্থাৎ প্রতি ঘন্টাতেই শিক্ষক পরিবর্তন হয় না। যিনি চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষক তিনি এই শ্রেণীর সব বিষয়েরই ক্লাস নেবেন।

শিক্ষার্থীরা যে এলাকায় বাস করবে তাদের কে সেই এলাকার জন্য নির্ধারিত স্কুলে ভর্তি হতে হবে। পিতা মাতার কর্মস্থান পরিবর্তনে বাসস্থান পরিবর্তন হলে ছেলেমেয়েরা ও বিদ্যালয় পরিবর্তন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

PTA এর কাজ হলো ছেলেমেয়ের প্রতি শিক্ষকদের কোন অবহেলা হলে তা খেয়াল করা এবং শিক্ষকগণ ও বাবা, মাকে সন্তানের লেখাপড়া অগ্রগতি বা অবনতি সম্বন্ধে অবহিত করা। এছাড়া ভোর বেলায় ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে আসার সময় বিভিন্ন ব্যস্ত রাস্তার ক্রসিংয়ে হলুদ পাতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় যাওয়া ও বাড়ীতে ফেরার সময় রাস্তা পার করতে সহায়তা করা। **PTA** এর সদস্য সন্তানের মা কে পর্যায়ে ক্রমে এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে পালন করতে হয়।

প্রাথমিক থেকে উচ্চ পর্যায়ের সকল শিক্ষা বৎসর এপ্রিল মাস থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসে শেষে হয়ে থাকে। শিক্ষা বৎসর নষ্ট হওয়ার মতো কোন সুযোগ নেই।

ঐতিহাসিক ভিনাকের মতে,

"তখন জাপানে শিক্ষায় মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ়করা, জনগণের মানসিক সংকীর্নতা দূরীকরণের জন্য নয় জাপানি সম্রাট ও সরকারের প্রতি জনগণের নির্বিচার আনুগত্য বজায় রাখাই ছিল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য"[৪]।

সাহিত্য

প্রাক-আধুনিক জাপানে সাহিত্যের উপর বিদেশী প্রভাব দেখা দেয়। কেবল মাত্র কবিতা রচনায় জাপানি কবি কুল স্বকীয়তা বজায় রাখে। **Shoyo, Koyo, Rohan** প্রভৃতি ধীসম্পন্ন জাপানি সাহ্যিকগণকে দেখা যায় রোমান্টিক সাহিত্যের স্থলে প্রকৃতিধর্মী এবং বাস্তবধর্মী সাহিত্য রচনা করতো। জাপানি Ishikawa Takuboku ১৯০৯

Dhaka University Institutional Repository

খ্রীষ্টাব্দের দিনপঞ্জিতে সুস্পষ্টভাবে জাপানের আধুনিক জীবনের চিত্র মেলে। তার কবিতার ভাবধরা ছিল আধুনিক দুনিয়ার চিন্তা ধারা করা দ্বারা প্রভাম্বিত।

ক্লাসিক্যাল ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় পারদর্শী Soseki **Nastume** রচনায় আদর্শবাদিতায় প্রভাব দেখা যায়।

উপন্যাসে আধুনিকতায় পরিচয় মেলে। উপবিংশ শেষের দশকগুলিতে উপন্যাস সাহিত্যি ছিল রাজনীতি বিষয়ক।

১৮৯০ এর পর জাপানি উপন্যাস ব্যক্তিগত জীবনী ভিত্তিক হয়। আধুনিক সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকরূপে পরিচিত অধ্যাপক Natsume Soseki তিনি তাঁর রচনাটিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রকৃত অনুভূতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর অনুপ্রেরনায় অপর এক শ্রেণীর উপন্যাসিকগণ আবির্ভূত হন। যারা white Birch School of noretist নামে পরিচিত।

Soseki র অন্যতম শিষ্য **Ryunosuke** ছিলেন ১১২০ দশকের একজন প্রখ্যাত জাপানি লেখক। বিংশ শতকের জাপানি সাহিত্য ধর্ম মুখ্য উপকরণ ছিল না।[৫]

জাপানী কলা-কৌশল

প্রাক রেষ্টোরেশন যুগের জাপানের চিত্র শিল্পে ও শোভাপ্রদ শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই জাতীয় শিল্পে চীনের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তবে রেষ্টোরেশনর পর জাপানি জন সাধারণ পাশ্চাত্য ধরনের চিত্রশিল্পের বিশেষ উৎসাহ দেখাননি। শিল্পের উপর রক্ষণশীল প্রভাব বিস্তার করে। মৃৎশিল্পে ও চীনামাটির শিল্পে জাপানের উন্নতি ছিল উল্লেখ্যযোগ্য। মন্দির দেবালয়ের সাধনের উপর পাশ্চত্য শিল্প প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। এছাড়া লাফা শিল্পেও সূচিকর্মে তাঁত বোনার শিল্পে জাপান তখন অগ্রনী ভূমিকা পালন করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানীরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে বেশ কিছু রীতিনীতি পালন করে আসছে। যা তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ। পৃথিবীর দ্রুত শিল্পোন্নত দেশ জাপান। উন্নয়নের সাথে সাথে আধুনিকতার পরশে সমাজ জীবনে অনক কিছু বদলে যায়। জাপানীরা তাদের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছে। যা দেখে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য মন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি জাপানে অধ্যয়ন করার সময় যা উপলব্ধি করেছি বা দেখার সুযোগ হয়েছে তা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

এমা (Ema)

এমা হালকা কাঠের তৈরী চালা ঘরের ছাদের আকৃতির কাঠের টুকরা। চার থেকে ছয় ইঞ্চি সাইজের এই কাঠের টুকরার এক পিঠে ঘোড়ার ছবি আঁকা থাকে। অন্য পিঠে নিজের সৌভাগ্য বা বিশেষ কোন ইচ্ছা প্রার্থনা হিসেবে লিখে শিন্তো উপাসনালয়ের বাইরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। নিজের কোন কামনা পূরণ হলে তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ও কিছু লিখে ঝুলিয়ে রাখা যায়[৬]।

শিন্তো উপাসনালয়ের সামনে কিনতে পাওয়া যায়। আজ কাল এমাতে ঘোড়ার ছবি ছাড়া ও বিভিন্ন ধরণের ছবি আঁকা হয়। কেউ কেউ বিভিন্ন ধরণের এমা সংগ্রহ করে থাকে। জাপানে বিভিন্ন উপাসনালয়ে অসংখ্য এমা ঝুলতে দেখা যায়। যেগুলোর বেশীর ভাগের পেছনে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম এবং তাদের পছন্দনীয় স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম যেখানে তারা ভর্তি হতে চায়।

Dhaka University Institutional Repository

শিমেনাওয়া দড়ি (Shimenawa)

শিমেনাওয়া হচ্ছে পূর্ব পাক দেওয়া খড়ের দড়ি। যেটা থেকে টানা ট্রাইপ সাদা কাগজ ঝুলতে থাকে। প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বাস করা হয় যে এই শিমেনাওয়া দড়ি থাকলে শয়তান বা দুষ্ট আত্মারা দূরে থাকে।

সাধারণত বাড়ীর প্রধান দরজার উপরে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টানানো থাকে। এছাড়া শিন্তো উপসানালয়ে ঝোলানো থাকে। সাধারণত নববর্ষের দিন জাপানীদের বাড়ীর প্রধান দরজার উপর এই শিমেনাওয়া দড়ি টানতে দেখা যায়। যার সাথে সাজানো থাকে ছোট্ট ডালপাতা সহ কমলা, একটুকরা সমুদ্রের শৈবাল বা গলদাচিংড়ি এবং ফার্ণ পাতা। কমলা হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের জন্য, সমুদ্রের শৈবাল সুখের জন্য, চিংড়ী দীর্ঘ জীবন এবং ফার্ন পাতা বিশুদ্ধতার জন্য।

নোরেন পর্দা (Noren)

জাপানের দোকানে বিশেষ করে জাপানী খাবার, পানশাল বা রাস্তার ধারে ছোট দোকান গুলোতে এক ধরনের অর্ধেক পর্দা ব্যবহার করা হয়। তাকে বলা হয় নোরেন পর্দা। এই পর্দা অনেক সময় দীর্ঘ দিন ধরে অর্থাৎ বাংশানুক্রমে পরিচালিত দোকানের মর্যাদা বহন করে।

যখন কেউ নতুন দোকান আরম্ভ করেন সাধারণত তার বন্ধুরা কেউ নোরেন পর্দা দিয়ে উৎসাহ দিয়ে থাকেন। নোরেন পর্দায় বিভিন্ন ডিজাইন হয়ে থাকে। অনেক পরিবারে বসার ঘর ও রান্না ঘরে এই পর্দা ব্যবহার করতে দেখা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

উচিওয়া (Uchiwa)

উচিওয়া এক ধরণের হাত পাখা। বাঁশ এবং কাগজ দিয়ে তৈরী হয় এই পাখা। সরু বাঁশের ফ্রেমের উপর সুদৃশ্য কাগজ লাগিয়ে এই পাখা তৈরী হয়। গোলাকার বা চার কোনাকৃতি বাঁশের ফ্রেমের এই পাখার হাতলটি ও বাঁশের তৈরী। সাধারণত একজন ব্যক্তি নিজেকে বাতাস করার জন্য এই পাখা ব্যবহার করে থাকেন।

এই পাখা গ্রীষ্ম কালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় সাবইকে। গ্রীষ্ম কালীন জাপানী পোশাক ইয়ুকাতার সাথে এই পাখা বেশ মানানসই দেখায়।

ছেনছু (Sensu)

ছেনছু হচ্ছে ভাঁজ করা যায় এমন পাখা। বাঁশের ফ্রেমের উপর কাগজ দিয়ে তৈরী এই পাখা। পাখা মেলে ধরলে দেখা যায় তাতে রয়েছে সুন্দর কোন শৈল্পিক দৃশ্য বা ক্যালিগ্রাফী। গ্রীষ্ম কালে নিজেকে বাতাস করার জন্য এটা ব্যবহার করা হলেও এর কিছু সামাজিক মর্যাদা আছে। এটা বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে উপহার দেওয়া যায়। শ্রদ্ধা বা শুভেচ্ছা স্বরূপ এটা উপহার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া উপহার হিসেবে ও আদান প্রদান হয়ে থাকে। জাপানী নাচ, জাপানের অনুষ্ঠান, কবিতা আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদির সময় ষ্টেজে ছেনছু ব্যবহৃত হয়। চা পানের অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হলে অবশ্যই সাথে করে চা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত ছোট ছেনছু নিয়ে যেতে হয় [৭]।

Dhaka University Institutional Repository

ফুরিন (Furin)

ফুরিন হচ্ছে ছোট্ট ঝুলন্ত ঘন্টা। ধাতু কাঁচ বা পরসিলিনের তৈরী এই ঘন্টা। বাড়ীর প্রধান দরজা বা জানলার বাইরে বা বাতাস চলাচলের সুবিধাজনক জায়গায় গ্রীষ্ম কালে ঝোলানো থাকে এই ছোট্ট ঘন্টা। ঘন্টার মাঝখানে ছোট্ট কাগজে লেখা থাকে কোন ছোট্ট কবিতার লাইন।

গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে যখন ফুর ফুরে বাতাস বয়ে যায় তখন রিন রিন শব্দে বেজে যায় এই ঘন্টা। বাতাসের শীতলতা মানুষের শরীর এবং ঘন্টার রিন রিন শব্দ মানুষের ক্লান্তিময় মনকে জুড়িয়ে দিয়ে যায় শীতল এক সজীবন অনুভূতিতে।

অরিগামী (Origami)

অরু অর্থ ভাংগা বা ভাঁজ করা এবং কামি অর্থ কাগজ। এই দুইয়ে মিলে অরিগামী। যা বলতে বোঝায় কাগজ ভাঁজ করে বিভিন্ন জীব-জন্তু, ফল-ফুল নৌকা ইত্যাদির আকৃতি তৈরী করা [৮]।

জাপানের ছেলেমেয়েরা স্কুলে, পরিবারে এই কাগজ দিয়ে বিভিন্ন বস্তুর আকৃতি তৈরী করা শেখে। কাঁচি দিয়ে না কেটে শুধু মাত্র কাগজ ভাঁজ করার এই কৌশল সত্যিই আনন্দময়। ষ্টেশনারী দোকানে বিভিন্ন রঙের এবং ডিজাইনের বর্গাকৃতি কাগজ পাওয়া যায়। সারসপাখী, নৌকা মুকুট, খরগোশ, বল, সোনালী মাছ এগুলো বেশ জনপ্রিয় অরিগামী। জাপানে বলা হয় অরিগামী কল্পনা শক্তির স্ফুরন ঘটায় এবং হাতের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কোতাৎসু (Kotatsu)

কোতাৎসু হচ্ছে কাঠের বা প্লাষ্টিকের ফ্রেমের টেবিল। উপরিভাগ সমতল টেবিলের মতই তবে চারিদিকে লেপের মত পর্দা রয়েছে। টেবিলে মাঝের ফ্রেমে (ভেতরে) কয়লা জ্বলতে থকে এবং টেবিলের নীচ গরম রাখে। বিদ্যুতের প্রসারে এখন আর কয়লার ব্যবহার নেই।

বৈদ্যুতিক ডিভাইসের মাধ্যমে টেবিলের নীচে গরম রাখা হয়। ঘরের মেঝেতে পাতা টেবিল ঘিরে চার থেকে ছয়জন বসতে পারে। রাতের খাবারের পর পরিবারের সকল সদস্য সাধারণত এই টেবিলের চারদিকে ঘিরে বসে পা ঢুকিয়ে রাখে গরম লেপের নীচে। সারাদিনের পারিবারিক প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বা বিশেষ কোন ঘটনা আলাপ হয় তখন। মিষ্টি জাতীয় খাবার বা ফল পরিবেশিত হয় তখন। ব্যস্ত জাপানীদের পারিবারিক মিলন কেন্দ্র এই কোতাতসু [৯]।

ককেশী পুতুল (Kokeshi)

ককেশী হচ্ছে কাঠের তৈরী সিলিন্ডার আকৃতির পুতুল। যার মাথা হয়ে থাকে গোলাকৃতি। সাধারণত পুতুলগুলো হয়ে থাকে মেয়েদের চেহারায়। চোখ, চুল, নাক, ভ্রু আঁকা থাকে সুদৃশ্য রঙে। এদো রাজত্বকালে এই ককেশী পুতুলের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়।

বিভিন্ন পর্যটন এলাকায় সেই এলাকার বিশেষ ককেশী পুতুল পাওয়া যায় সুভ্যেনির দোকানগুলোতে। ভ্রমন পিপাসু অনেক লোকের বাড়ীতে দেখা যাবে সাজানো রয়েছে বিভিন্ন এলাকার নানা রঙের ককেশী পুতুল।

Dhaka University Institutional Repository

হাশি (Hashi)

চীন দেশের মতো জাপানো ও খাবার গ্রহণ করার সময় জাপানীরা ব্যবহার করে সরু অগ্রভাগের পেন্সিলের মতো কাঠি। সাধারণত বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরী হয়। পরিবারে ছেলেমেয়েরা তার বাবা, মা বা দাদা, দাদীর কাছ থেকে হাশি ব্যবহার করা শেখে। তাই বয়সের সাথে সাথে সবই দক্ষ হয়ে উঠে হাশি ব্যবহারে[১০]।

হাশির অদক্ষ ব্যবহার সামাজিক ভাবে লজ্জাজনক। প্রতিদিন নিজ বাড়িতে ব্যবহারের হাসি কাঠের তৈরী এবং সুদৃশ্য ডিজাইন বা রককমারী রঙে পেইন্ট করা থাকে। কিন্তু বিভিন্ন রেঁস্তোরাতে একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার হাসি রয়েছে। তাকে বলা হয় ওয়ারি বাসি। তা হয়ে থাকে সাদামাটা কাঠের বা বাঁশের, কোন রঙ বা ডিজাইন ছাড়া।

হাচি মাকি (Hachimaki)

ক্রীড়া অনুষ্ঠান সামাজিক সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় উৎসবে জাপানীরা মাথায় একটুকরা কাপড় কপালের উপর ঘুরিয়ে মাথার পেছনে রিবনের মতো বেঁধে রাখে। উৎসবের সময় সাধারনত সরু তোয়ালে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অন্যান্য সময়ে সরু কাপড়ের টুকরা ব্যবহার করা হয়। সাধারনত তাতে লিখা থাকে সাফল্য হয় বা এ ধরনের উৎসাহ জনক শব্দ[১১]।

ছাত্ররা ব্যবহার করে থাকে পরীক্ষার পূর্বে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়ার সময়। কোন সমাবেশ বা রাজনৈতিক মিছিলের সময় দলের স্লোগান লেখা থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ বিষয়ে নিজকে মানসিক ভাবে মনোযোগ রাখার অদ্যম হিসেবে এই হাচিমাকির ব্যবহার প্রকৃতপক্ষে কোন বিশেষ বিষয়ে নিজকে মানসিক ভাবে মনোযোগ রাখার উদ্যম হিসেবে এই হাচিমাকির ব্যবহার প্রচলিত। জাপানী ভাষায় হাচিশব্দের অর্থ মাথার করোটি এবং মাকি এসেছে পেঁচানো শব্দের মূল ক্রিয়া মাকু থেকে।

বোনেন কাই (Bonenkhai)

প্রতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মাঝা মাঝি বা শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয় বোনেন কাই। বছরকে বিদায় দেয়ার সামাজিক অনুষ্ঠান এটি। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, কোম্পানী, তাদের সদস্য, কর্মচারীদের নিয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

সারা বছরের অপ্রতিকর ঘটনা গুলো সবাই ভুলে যায় এই অনুষ্ঠানের কয়েক ঘন্টার সুখী সময়ে, পান আহার সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে এবং আগামী বছরের জন্য সম্মিলিত ভাবে কাজ করে যাওয়ার সংহতি ও আশা প্রতিফলিত হয় এই বোনের কাই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে[১২]।

গ্রীষ্ম কালের চিঠি (Shochu-mimai)

গ্রীষ্ম কালে নিজের আত্মীয় বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে খোঁজ খবর নেওয়া জাপানীদের একটি পুরাতন সামাজিক রীতি। দিন দিন জাপানীদের কর্মব্যস্ততা ও কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী বাসস্থান পরিবর্তনের ফলে বাড়ীতে গিয়ে খোঁজে নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠেনা অনেক ক্ষেত্রই।

Dhaka University Institutional Repository

তাই পত্রের মাধ্যমে আত্মীয় বন্ধুদের খোঁজ নেওয়া একটি অবশ্য পালনীয় সামাজিক কর্তব্য। জুলাইয়ের শেষ দিকে বা আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই পোষ্টকার্ড পাঠিয়ে আত্মীয় বন্ধুদের শারীরিক সুস্থতা ও সতর্কতা কামনা করে এবং নিজের বা পরিবারের খবর জানানোর রীতি রয়েছে[১৩]।

নববর্ষের কার্ড (Nenga-jo)

জাপানে নূতন বছরে আত্মীয় বন্ধুকে শুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো যদিও পাশ্চাত্য রীতি বা খ্রীষ্টমাস কার্ডের সাথে মিল রয়েছে তবে পার্থক্য হচ্ছে খ্রীষ্টমাস কার্ড প্রাপকের হাতে খ্রীষ্টমাসের পূর্বে পৌছানো এবং জাপানে নববর্ষের কার্ড পাঠানো হয় ডিসেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি সময় এবং ডাক বিভাগ তা পৌঁছে দেয় নববর্ষের দিগন্ত ভোরে। ফলে বন্ধু আত্মীয় স্বজনের শুভেচ্ছা কার্ড নববর্ষের দিনকে আরোও আন্দময় করে তোলে।

নববর্ষের কার্ডে ডাক বিভাগ ক্রম নাম্বার ব্যবহার করে থাকে সারা জাপানজুড়ে। সবার কার্ডের উপর এই নম্বর দেওয়া থাকে। জানুয়ারী মাসের মাঝা মাঝি এই নাম্বারের উপর ড্র হয়ে থাকে এবং যাদের কার্ডের নাম্বার ড্রতে উঠবে তাদের ডাক বিভাগ সৌজন্য উপহার পাঠিয়ে থাকেন। পত্রিকাতে এই নাম্বার ঘোষনা করা হয়।

বর্ষ শেষের উপহার (Seibo)

বছরের শেষে উপহার প্রদানের রীতি রয়েছে জাপানে। এ বছর যারা বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করেছেন কাজে কর্মে ব্যবসায় এবং সামাজিক ভাবে যারা

Dhaka University Institutional Repository

সম্মানী তাঁদের এই উপহার দেওয়া হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। জাপানী ভাষায় ছেইবো বলে পরিচিত এই প্রথা[১৪]।

বিবাহের ঘটক, পরিবারের চিকিৎসক অথবা চা, ইকেবানা (ফুলসাজানো) ইত্যাদি জাপানী সংস্কৃতি বিষয়ের শিক্ষক তাঁদের প্রাচীন কাল থেকে হাতে দেওয়া হতো এই উপহার। কিন্তু ইদানীং উপহার বিক্রির দোকানে উপহার পছন্দ করে নাম ঠিকানা দিয়ে দেওয়া হয়। দোকানী তার নিজ দায়িত্বে মনোরোম মোড়কে তা পৌছে দেন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ঠিকানায়।

একিবেন (Ekiben)

সারা জাপানেই রয়েছে রেলওয় নেটওয়ার্ক। ট্রেনে ভ্রমন করার সময় বাইরের দৃশ্যগুলো দেখতে দেখতে দুপ্যুরের লাঞ্চ করার আনন্দ রয়েছে। দূর পাল্লার ট্রেনগুলোতে তাই জাপানীদের লাঞ্চ বক্স নিয়ে উঠতে দেখা যায়। সারা জাপানেই দুপুরের খাবারের স্বাভাবিক সময় হচ্ছে দুপুর বারোটা। একি (Eki) মানে ষ্টেশন bento মানে লাঞ্চ বক্স। এই মূল শব্দ সংক্ষিপ্ত হয়ে একিবেন (Ekiben) হিসেবে প্রচলিত[১৫]। ষ্টেশনে খাবার বিক্রির এই পদ্ধতিতে শুরু হয় ১৮৮০ সালে দিকে। হকাররা ট্রেন থামলে জানালার কাছে এসে হাজির হতো গলায় ঝুলানো বক্স নিয়ে যেতে থাকতো গোল করে রাখা ভাত, সবজি বা মূলার আচার। ১৮৯৭ সাল পর্যন্ত হকারদের ফেরি করতে দেখা গিয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে ষ্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করার সময় কমে গিয়েছে। ট্রেনের গতি দ্রুততর হয়েছে।

নূতন ট্রেন গুলোর জানালা খোলার পদ্ধতি ও বদলে গিয়েছে। কিন্তু একিবেন হারিয়ে যায়নি, স্থান করে নিয়েছে প্লাটফরমের ছোট্ট দোকানগুলোতে এবং ট্রেনের

Dhaka University Institutional Repository

খাবার বিক্রির কামরায় বা চলন্ত ট্রেনের ভেতরে ট্রলিতে। দূর পাল্লার যাত্রীরা ট্রেনে আরোহন করার আগেই কিনে নেন একিবেন। সুদৃশ্য হালকা কাঠের বাক্সে কয়েক রকম খোপের ভেতর রয়েছে ভাত, সবজি, মাছ ইত্যদি। যে এলাকায় ভ্রমন করছেন সেই এলাকার নাম করা খাবার দিয়ে তৈরী একি বেন রয়েছে। তাই নিজের বাড়ী বা কর্মস্থলের কাছে না পাওয়া খাবার পেয়ে প্রীত হন সবাই[১৬]।

জুডো (Judo)

Judo, জাপানী ভাষায় Ju মানে gentle, Do মানে পদ্ধতি বা পথে। অর্থাৎ ভদ্র ভাবে বা শৃংখলার পতে এই দুই শব্দ মিলে জুডো শব্দ গঠিত। প্রাচীন কাল থেকেই জাপানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের পদ্ধতিতে এই আত্মরক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে আসাছিল। নিজকে অন্যজনের খালি হাতের আক্রমন বা কোন প্রকার অস্ত্র দিয়ে আক্রমনের পরিস্থিতিতে তার রক্ষার পদ্ধতি হিসেবে এর প্রচলন শুরু হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মিঃ Jigoro kano আধুনিক জুডোর প্রচলন করেন। তিনি Kodokan Hall প্রতিষ্ঠা করেন। যার মাধ্যম আজ জুড়ো ক্রীড়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালে আন্তর্জাতিক জুডো ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৩টি দেশ এই ফেডারেশনের সদস্য। জাপানে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পছন্দ অনুযায়ী জুডো শিখতে পারে। এছাড়া ও জুডোর জন্য বিশেষ স্কুল রয়েছে[১৭]।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানের নাটক

২০০৯ সালের ৭ মার্চ ঢাকার শিল্পকলা একাডেমীতে একটি জাপানী নাটক অভিনত হয়েছে। নাটকটির নাম একশত বস্তা চাল।

একশত চল্লিশ বছর পূর্বের কথা। জাপানের নাগাওকা এলাকার গৃহযুদ্ধের (১৮৬৮-৬৯) পর। গৃহযুদ্ধের ফলে নাগাওকা এলাকায় দূর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছিল। কাজেই জনগণ অনেক দিন যাবৎ ভাত খেতে পারেনি। ১৮৭০ সালে নাগাওকা এ এলাকার রাজ্যপ্রধানকে সহায়তা স্বরূপ একশত বস্তা চাল প্রেরণ করেন মিনে ইয়ামার রাজ্য প্রধান। অনেকদিন পর ভাত খেতে পারবে জেনে এলাকার জনগণ আনন্দিত হলো। কিন্তু রাজ্য প্রধান জনাব তোরাসাবুরো কোবাইয়াশি সিদ্ধান্ত নিলেন এই চাল বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বিদ্যালয় তৈরী করবেন। এতে সকলে তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। এমনকি তাকে হত্যা করতে চাইল। কিন্তু অনেক চেষ্টার পর সকলকে তিনি বুঝাতে সক্ষম হলেন যে, এই চাল একবার খেলেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু বিদ্যালয় হলে ছেলেমেয়েরা জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং এক সময় তারাই দেশের সমৃদ্ধি বয়ে আনবে। অবশেষে তিনি বিদ্যালয় তৈরী করেন ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য।

এশিয়ার দ্রুততম শিল্পোন্নত ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী দেশ জাপান। যে দেশ ২য় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। জাপানের চারদিকে সমুদ্র। দ্বীপ দেশ জাপান। শিল্পন্নোয়নের জন্য সবেচেয়ে প্রয়োজনীয় যে খনিজ পদার্থ লোহা, তামা ইত্যাদির কোনটিই নেই জাপানে। কিন্তু জাপান তার জনগণকে মানব সম্পদে রুপান্তরিত করেছে, সকল নাগরিকের জন্য সমভাবে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে। শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড এই কথাটি জাপানীরা প্রমাণিত করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

জাপানে বাঙ্গালী সমাজ

বঙ্গভাষীদের জাপান আগমনের সূচনা কবে থেকে, তার সঠিক কোনো সন্ধান এখন আর মেলে না। ১০৪০ সালে শ্রীজ্ঞান অতিশ দীপঙ্কর বিক্রমপুর থেকে তিব্বতের পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন । এর কয়েক দশক আগে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সুবর্ণদ্বীপ ছিল তাঁর গন্তব্য। একাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তিব্বতে দেহত্যাগ করেন বাংলার এই কৃত বৌদ্ধপন্ডিত। জাপান অবধি তাঁর আসা সম্ভব না হলেও মহাযান বৌদ্ধধর্মের যে ধারার সংস্কার তিব্বতে তিনি করেছিলেন, তারই একটি প্রবাহ পরবর্তীকালে চীন হয়ে জাপানে এসে বিস্তার লাভ করে। সেদিকে থেকে রঙ্গের জাপানে সংস্পর্শে আসার প্রথম পরোক্ষ ও মুখ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে আমাদের বিক্রমপুরের এই কৃতী সন্তানকে গণ্য করা যায়।

মধ্যযুগে জাপানের সঙ্গে ভারতের সরাসরি সংযোগের তেমন প্রমাণ না থাকায় আমরা ধরে নিতে পারি বাংলার সঙ্গে জাপানের সরাসরি যোগাযোগ কিংবা জাপান সম্পর্কে বাংলার লোকজনের উৎসাহী হয়ে ওঠার সূচনা ব্রিটিশ ভারতের শেষ দিকটায় এসে। জাপানে ততোদিন মেজি পুনরুত্থানের পথ ধরে সূচীত হয়েছে যুগান্তকারী অনেক পরিবর্তন, আমাদের সংবাদ-মাধ্যমের সেই আদি যুগে তার কিছু খবরাখবর বাংলার লোকজন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে নিশ্চয় পেয়ে থাকবেন। বাংলার সেকালের শিক্ষিত সমাজের ভাবনাচিন্তা প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ে জাপানের বিশিষ্ট গবেষক অধ্যাপক কাযুও আযুমা কবি নবীনচন্দ্র সেনের বিশেষ একটি কবিতার যে পঙক্তির উদ্ধৃতি দিতে পছন্দ করেন সেটি হচ্ছে এরকম: অসভ্য জাপান সেও উঠেছে জেগে। নবীনচন্দ্র সম্ভবত কবিতাটি লিখে থাকবেন রুশ-জাপান যুদ্ধের পরে। ফলে আমরা ধরে নিতে পারি এর আগে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাংলা বিপজ্জনের কাছে পিছিয়ে পড়াকে কবি নবীনচন্দ্র সেন অখ্যায়িত করেছেন অসভ্য হিসেবে। ফলে রাশিয়ার মতো ইউরোপীয় শক্তিকে যুদ্ধে পরাজিত করে সামরিক এবং অর্থনৈতিক দুদিক থেকেই মেজি পুনরুত্থান পরবর্তী জাপানের

Dhaka University Institutional Repository

দ্রুত অগ্রযাত্রা সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলেই হয়তো ভারতবাসীদের প্রতি একইভাবে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে নবীনচন্দ্র লিখেছিলেন তাঁর সেই কবিতা।

মেজি পুরবুত্থান একদিকে যেমন বিদেশীদের জন্যে জাপানের দুয়ার খুলে দিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি জাপানের লোকজনের জন্যেও বিদেশকে জানার সুযোগ পরিবর্তিত সেই পরিস্থিতি এনে দেয়। ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জাপানিদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। এদের মধ্যে কেউ হয়তো-বা বিদেশে গিয়েছেন ভাগ্যের অন্বেষণে, আর অন্যেরা বিদেশকে জানতে অথবা বিদেশে জাপানের বার্তা পৌঁছে দিতে। উল্লেখ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বসতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে জাপানে লোকজনের যাত্রার সূচনা অনেকটা সেই সময়ে। অন্যভাবে আবার জাপানের মেজি প্রশাসন উদ্যেগী হয়ে যে একদল তরুণকে প্রাচ্যের অগ্রগতির বিভিন্ন দিকের শিক্ষাগ্রহণের জন্য ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে পাঠিয়েছিল, তাদের অনেকেই শিক্ষার পাঠ শেষ করে দেশে ফিরে এসে নানাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করেন। দ্বিতীয় এই তালিকার উল্লেখযোগ্য এক ব্যক্তিত্ব হলেন জুকিচি ইনোউয়ে, এগারো বছর বয়সে যাকে বিলেতে পাঠানো হয়েছিল শিক্ষাগ্রহণের জন্য। এক দশকেরও বেশি সময় পরে দেশে ফিরে এসে শুরুতে তিনি জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে মন্ত্রণালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের পছন্দের পেশা লেখালেখিতে যুক্ত হন। ইনোউয়ে হচ্ছেন ইরেজি-জাপানি অভিধানের প্রথম সংকলক। এছাড়া বিদেশীদের কাছে জাপানের পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৯১০ সালে প্রকাশিত Home life in Tokyo, শতবর্ষ আগে জাপানের রাজধানীর নানারকম তাৎপর্য পূর্ণ দিকের বর্ণনা যেখানে পাওয়া যায়। টোকিওর বিভিন্ন দিকের এবং রাজধানীবাসীর জীবনের অনেক কিছু সেই বইয়ে তুলে ধরা হলেও সেখানে নেই জাপানের রাজধানীতে সেই সময়ে বসবাসকারী বিদেশীদের কোনোররকম উল্লেখ। ফলে একদিক থেকে কিছুটা অসম্পূর্ণতা তাতে রয়ে গেছে, যে ফাঁক পূরণ করা

Dhaka University Institutional Repository

হলে আমাদের পক্ষে হযতো-বা জাপান যাত্রী আদি বাঙালিদের পরিচয় জানতে পারা কিছুটা সহজ হতে পারে।

বিদেশকে জানা এবং বিদেশে জাপানের পরিচিত তুলে ধরার লক্ষ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পরা অন্য জাপানিদের মধ্যে সেই সময়ের বিশিষ্ট যে কযেকজন ব্যক্তিত্বকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে আসতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত হচ্ছেন দার্শনিক ও শিল্প-সমালোচক তেনশিন ও কাকুরা। জাপানি জাতীয়তাবাদের অন্যতম এই স্বপ্নদ্রষ্টা। ১৯০২ সালে ভারত ভ্রমনের সময় ঠাকুর পরিবারের দুই শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্যে ওকাকুরা আসেন এবং সেইসূত্রে অচিরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গড়ে ওঠে তার গভীর সখ্য। তেনশিন ওকাকুরার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের ঘনিষ্ঠতার অনেক তথ্য পাওয়া যায় বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অধ্যাপক আযুমার বাংলাভাষায় লেখা বই প্রসঙ্গে: রবীন্দ্রনাথ ও জাপানে শিল্প-সংস্কৃতি শেখানোর বেশ কয়েকজন শিক্ষককে কবিগুরু যে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিলেন, সেই তথ্য অমরা পাই অধ্যাপক অযুমার গ্রন্থে।

তেনশিন ওকাকুরা অবশ্য তাঁর **"Awakening of japan"** গ্রন্থের কারণে ব্রিটিশ ওপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত বাংলার বিপ্লবীদের মধ্যেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। সেই জনপ্রিয়তা এবং এর নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হয়েও বিট্রিশ ভারতের তৎকালীন প্রশাসন **Awakening of Japan**- এর পাশাপাশি ওকাকুরা আরেকটি বই The Ideals of the East ভারতীয়দের জন্য নিষিদ্ধ পাঠ্যগ্রন্থ্যের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করতে তৎপর হয়ে ওঠে। বইদুটি ওকাকুরা লিখেছিলেন ভারত সফর শেষ করে দেশে ফিরে যাওয়ার পর। ইউরোপীয়দের ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকল থেকে মুক্ত হয়ে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তোলার গুরুত্বের পাশাপাশি এশিয়ার নবজাগরণে মহাদেশের নব্যশক্তি হিসেবে জাপানের আবির্ভাবের তাৎপর্যের

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারিত উল্লেখ সেখানে তিনি করেন। জাপান এবং চীনের সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের সন্ধানেই মূলত ভারত সফরে তিনি এসেছিলেন এবং সেই সফর নিশ্চিতভাবেই The Ideals of the East রচনার পেছন অনুপ্রেরনা জুগিয়ে থাকবে। বইটি ওকাকুরা লিখেছিলেন ইংরেজি ভাষায় এবং এর প্রথম সংস্কারণে যে-ভূমিকা সংযোজিত হয়, সেটির রচয়িতা ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভগিনী নিবেদিতা ওকাকুরাকে সেখানে উইলিয়াম মরিসের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে প্রয়াসী হন। তবে আমরা জানি, জীবনের শেষ এক দশকে ওকাকুরা ক্রমশই ধাবিত হয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের পিচ্ছিল এক পথে, অন্যদিকে উইলিয়াম মরিসের গন্তব্য ছিল সাম্যবাদী আদর্শের দিকে।

তবে মূলত এশিয়ার সমৃদ্ধ শিল্পকলা, বিশেষ করে ভারত, চীন ও জাপানের শিল্পকলার মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে এশিয়ার পুনর্জাগরণের বার্তাবহনকারী ওকাকুরা সেই গ্রন্থ তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভাবনাচিন্তায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে থাকবে। মার্কিন গবেষক রবার্ট ডার্নটনের ২০০১ সালে প্রকাশিত এক রচনা থেকে আমরা জানতে পারি, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাংলার একটি জাতীয়তাবাদী সমিতিতে পুলিশের অভিযানের পর যেসব বইপত্র আটক করা হয়, সেই তালিকায় ওকাকুরার গ্রন্থও অন্তর্ভূক্ত ছিল। তবে জাপান সম্পর্কে সেদিনের সেই উৎসাহ ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যেই কেবল সীমিত থাকেনি।

মেইজি পুনরুত্থান-পরবর্তী জাপান অবশ্য অল্পদিনের মধ্যেই ভারতবাসীদের আকৃষ্ট করতে শুরু করে এবং বেশ কয়েকটি ভারতীয় ব্যবসায়ী পরিবার সেই সময় কোবে এবং ইয়োকোহামায় নিবাস গড়ে নেয়। শ্রীজ্ঞান অতিশ দীপঙ্কর ভারতের সঙ্গে জাপানের পরোক্ষ সম্পর্কের আদি পুরুষ হিসেবে বিবেচিত হলে এঁরা হচ্ছেন সেই প্রত্যক্ষ পুরুষ, জাপানের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের সম্পর্কের ঐহিহাসিক ভিত্তি যাঁরা নিজেদের অজান্তেই গড়ে দিয়েছেন। জাপানে বসতিস্থাপনকারী সে-রকম ভারতীয় পরিবারের অধিকাংশ সিন্ধুর মাডোয়ারি হিসেবে পরিচিত হলেও অন্যান্য অঞ্চলের লোকজন অধিকাংশ যে সেই দলে একবারেই ছিলেন না, তা কিন্তু নয়। তবে বাঙালি সেখানে অন্তর্ভূক্ত ছিলেন কিনা তার সঠিক হদিস পাওয়া এখন মুশকিল হলেও, বাঙালির জাপান আগমনে খুব যে একটা দেরি হয়নি, তৎকালীন কিছু দুর্লভ দলিলপত্রে তার প্রমাণ সহজেই মেলে।

ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিনিধি হরিপ্রভা মল্লিক জাপানি নাগরিক উয়েমন তাকেদাকে বিয়ে করে হরিপ্রভা তাকেদা হয়েছিলেন আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে, ১৯০৬ সালে। ১৯১২ সালে প্রথম তিনি জাপান ভ্রমণ করেন। চারমাস স্থায়ী সেই ভ্রমনের শেষে দেশে ফিরে গিয়ে জাপান সম্পর্কে যে বই তিনি লিখেছিলেন সেখানে কিন্তু টোকিওর একটি বাঙালি পরিবারের উল্লেখ দেখা যায়। টোকিও তে ধর্মীয় উৎসব পালনের বর্ণনা দিয়ে হরিপ্রভা লিখেছেন: এতদুপলক্ষে টোকিও প্রবাসী একজন ভারতবাসীর গ্রহে ব্রহ্মোপাসনার বন্দোবস্ত হইল। আরও ৩-৪ জন ভারতবাসী উপস্থিত ছিলেন। সকলে এক আহারাদি হইল।

টোকিও প্রবাসী সেই ভারতবাসীরা যে বাঙালি ছিলেন, তার কোনো উল্লেখ হরিপ্রভা অবশ্য করেননি। তবে ব্রহ্মোপাসনার উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে তাদের পরিচয় সম্পর্কে আমরা আঁচ করে নিতে পারি।

অন্যকিছু সূত্রের কল্যাণেও অবশ্য হরিপ্রভা তাকেদার জাপান ভ্রমণের আগে, বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে জাপানে বাঙালির অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। একটি সূত্র হচ্ছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংরক্ষিত পুরনো দলিল পত্র, যার অনেকটাই সাধারণের ব্যবহারের জন্যে এখন উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ভারত যেহেতু প্রায় দুশো বছর ধরে ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ, তাই ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত ইতিহাসের অনেক গুরুত্বপূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

উপাদান অতীতের গোপন সে-রকম দলিলে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। টোকিও ব্রিটিশ দূতাবাসের ১৯৪২ সালের গোপন এক রিপোর্টে যেমন জাপানে ব্রিটিশবিরোধী তৎপরতায় নিয়োজিত ভারতীয়দের সম্পূর্ণ একটি তালিকা সংযুক্ত কিছুদিন পর সেই সময়ের শত্রুদেশ জাপানে অবস্থানকারী ভারতীয়দের সম্পর্কে গোপনে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা টোকিওর ব্রিটিশ কর্মকান্ডে জড়িত, সে-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে ভারতের তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রশাসনকে আগে থেকে এদের সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

রাসবিহারী বসুর বাইরে মুষ্টিমেয় অন্য যে-কয়েকজন বাঙালির উল্লেখ সেই তালিকায় পাওয়া যায়, শিশির কুমার মজুমদার এবং পি সি মজুমদার নামেই দুই বাঙালি সেখানে অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। সম্পর্কে এরা হচ্ছেন পিতা-পুত্র। ১৯৪২ সালে গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রণীত হলেও পি সি মজুমদার সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে, তার জন্ম ১৯১২ সালে টোকিওতে। টোকিওর ব্যবসায়ী শিশির কুমার মজুমদারের পুত্র তিনি। ১৯৪০ সালে ভারতে ফিরে যাওয়া পিতার অনুপস্থিতিতে জাপানে রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকলেও রাসবিহারী বসুর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইদানীং রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়মিতভাবে অংশ নিচ্ছেন।

পুত্র পি সি মজুমদারের জন্ম ১৯১২ সালে টোকিওতে হলে আমরা ধরে নিতে পারি পিতা শিশির কুমার মজুমদার সম্ভবত টোকিও এসেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকটায় কিংবা বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে। সেদিকে থেকে জাপানের আদি বাঙালি বর্তমানে বিস্মৃতির গর্ভে যাওয়া এই মজুমদার পরিবারকে ধরে নেওয়া যায়। রাসবিহারী বসুর জাপান আগমন তারও অনেক পরে ১৯১৫ সালে এবং রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো জাপান সফরে এসেছিলেন এরও একবছর পর ১৯১৬ সালে। তবে কবিগুরুর সেই প্রথম জাপান ভ্রমেণর পর লেখা বই জাপান যাত্রী এখনো বাংলা সাহিত্যে জাপান সংক্রান্ত অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ গোয়েন্দা রির্পোটে আরেক যে সম্ভাব্য বর্ণাঢ্য বাঙালি চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তিনি হচ্ছেন বি ডি গুপ্ত। বি ডি গুপ্তকে এ-কারণে সম্ভাব্য বাঙালি বলতে হয় যে, গোপন সেই দলিলের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন উড়িষ্য রাজ্যের পাটনার মহারাজার অধীনে কর্মরত পিতার সন্তান। কর্মসূত্রে পিতা পাটনায় অবস্থান করলেও ভারতে বি ডি গুপ্তের সবরকম তৎপরতা ছিল কোলকাতা কেন্দ্রিক।

লেখাপড়ার সূত্রে ত্রিরিশের দশকে বি ডি গুপ্তের জাপান আগমন। পাঁচ বছর জাপানে অবস্থানের পর রং-সংক্রান্ত রাসায়নবিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা শেষ করে ১৯৪০ সালের শেষদিকে তিনি ভারতে ফিরে যান। ভিন্ন এক জাহাজে পাঠানো তাঁর মালামালের মধ্যে ছিল বিশাল আকারের এক কাঠের বাক্স। জাহাজ কলম্বোয় নোঙর করার পর সিংহলের পুলিশের মন বাক্সের ভেতরের মালামাল নিয়ে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় জাহাজের আগমন সম্পর্কে কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগকে।

আগে থেকে তারা খবর পাঠিয়ে রাখে। অন্যদিকে ইতোমধ্যে কলকাতা পৌঁছে বাক্সের মালিক বি ডি গুপ্ত কর্মকর্তাদের আচরণে বিপদে আছে সম্ভবত আগে থেকে আচঁ করতে পেরেছিলেন। ফলে বাক্স শেষ পর্যন্ত কলকাতায় পৌঁছাবার আগেই তিন আত্মগোপনে চলে যান এবং গোপনপথে আবারও জাপানে ফিরে গিয়ে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশবিরোধী কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পারেন।

দুই বিশ্বযুদ্ধে মধ্যবর্তী সময়ে জাপানের তুলনামূলক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভারতের সঙ্গে জাপানের বাণিজ্যিক সম্পর্কে আরো সংগত করে তোলে এবং নতুন যে অনেক ভারতীয় নাগরিক সেই সময়ে জাপানে আসেন, সেই দলে বাংলার বেশকিছু লোকজনও অন্তর্ভুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। চট্টগ্রামবাসী সে-রকম এক মুসলমান বাঙালি সম্পর্কে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত ছিলেন বছর দুয়েক আগে প্রয়াত দীর্ঘদিনের জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশী ইসকান্দর আহমেদ চৌধুর। অসময়ে মৃত্যু সম্ভবত তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজেও নিয়ে এসেছে স্থায়ী এক বিরতি।

ত্রিশের দশকের শুরু থেকে জাপান-প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে অনেককে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। শুরুতে রাসবিহারী বসু এবং পরবর্তীকালে জার্মানি হয়ে জাপানে আসা নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বাধীন সেই রাজনীতি যেহেতু ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তির সমর্থক রাজনীতি, যুদ্ধে জাপানের পরাজয় তাই এদর অনেকের জন্যেই সাময়িক বিপর্যয় নিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে জড়িত অনেককে দেশে ফিরে যেতে অনুপ্রানিত করে এবং পূর্বের জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া মূলত ব্যবসায়ী মহলের সদস্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের কঠিন সেই দিনগুলোতে জাপানে থেকে যান।

সমস্যা-কবলিত কোনো অঞ্চল যেহেতু ভাগ্যান্বেশীদের আকৃষ্ট করতে পারে না, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের-পরবর্তী জাপানেও তাই বঙ্গসন্তানের আগমন তেমন লক্ষ্য করা যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম এখানে হচ্ছেন বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল। যুদ্ধাপরাধী হিসেবে জাপানের যুদ্ধকালীন নেতৃবৃন্দের বিচারের জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে চল্লিশের দশকের বছর তিনেক তিনি টোকিওতে কাটিয়ে গেছেন এবং ট্রাইবুনালের একমাত্র বিচারক হিসেবে নিজের দেওয়া ভিন্নমত রায়ে সমরবাদী জাপানের নেতৃবৃন্দের বেকসুর-খালাস দিয়ে জাপানের চরম দক্ষণপন্থীদের কাছে স্থায়ী এবং পূজনীয় আসন তিনি লাভ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

টোকিওর যে-বিতর্কিত মন্দির নিয়ে জাপানের সঙ্গে চীন ও দক্ষিণ কোরিয়ার সম্পর্কের টানাপোড়েন ইদানীং লক্ষ্য করা যায়, যুদ্ধে নিহত সকল জাপানি নাগরিকের পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধী হিসেবে শাস্তিভোগকারী জাপানের যুদ্ধকালীন নেতৃবৃন্দের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত সেই ইয়াসুকনি মন্দিরের জাদুঘরে আজও শোভা পেতে দেখা যায় বিচারপতি রাধাবিনোদ পালের প্রতিকৃতি। দুষ্টজন অবশ্য বলে থাকেন, চক্ষুলজ্জার খাতিরে যুদ্ধেকালীন জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজোর প্রতিকৃতি জাদুঘর-কর্তৃপক্ষ টানাতে পারছে না বলেই হয়তো তোজাকে নির্দোষ ঘোষণাকারী বিচারক সেখানে সদর্পে শোভা পাচ্ছেন।

ষাটের দশকের শুরুতে পূর্বে পাকিস্তানের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্মরত লোকজনও স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্যে জাপানে যেতেন জাপান ততদিনে যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে জটিলতা কাটিয়ে উঠে প্রবৃদ্ধির অর্থনীতির পথে দীর্ঘ বিরতিহীন যাত্রা শুরু করে এবং জাপানের কয়েকটি শিল্পজাত এশিয়ার অনেক দেশের কাছেই অনুকরণযোগ্য মডেল হয়ে দাঁড়ায়। সেইসূত্রে বিদ্যুৎ ও স্পাত খাতে নিয়োজিত সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেসব প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞ ষাটের দশকের শুরুতে জাপানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাদের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রসায়নবিদ কাজী জয়নুল আবেদিন ভিন্ন এক কারণে ব্যতক্রিমী চিহ্নিত হয়ে আছেন।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য স্বল্পকালীন সময়ে জাপানে সাগরের তীরবর্তী নিইগাতা শহরে এসেছিলেন বছরতিনেক আগে প্রয়াত বিক্রমপুরের এই কৃতী সন্তান। নিইগাতায় সেই স্বল্পকালীন অবস্থানেই জাপানি রমনী রিৎসুকো কোবাইয়াশির সঙ্গে তাঁর মন দেওয়া নেওয়া এবং সেইসূত্রে তরুণীকে বিয়ে করা। কাজী জয়নুল আবেদিন হচ্ছেন প্রথম বাংলাদেশী, জাপানি রমণীকে বিয়ে করে সন্ত্রাসীক যিনি দেশে ফিরে যান।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর স্ত্রী ষাটের দশকের সেই সূচনাকাল থেকেই নানারকম প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে থেকেছেন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর এখনো সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। মিসেস রিৎসুকো আবেদিন নিঃসন্দেহে হচ্ছেন সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে অবস্থানকারী জাপানি নাগরিক। ঢাকার মোহাম্মদপুর নিবাসী তিন সন্তানের জননী এই মহিলাকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঘরবাড়ি হারিয়ে স্বামী-সন্তান নিয়ে পথে এসে দাঁড়াতে হয়েছিল। তারপরও মনোবলে কোনোরকম চির তাঁর ধরেনি।

আরেক যে-জাপানি মহিলার এ-প্রসঙ্গে করতে হয় তিনি হলন শিগেকো বেগ। ষাটের দশকের শেষ দিকটায় প্রকৌশলী মির্জা ইকবাল বেগকে বিয়ে করে তিনিও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাবের বেশকিছু আগে নিবাস গড়ে নিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। তিনি সম্ভবত অন্যদিকে থেকে হচ্ছেন প্রথম জাপানি, মৃত্যুর পর যাঁকে বাংলার মাটিতে চিরসজ্জায় শায়িত করা হয়। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকটায় দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী বনানী গোরস্তানে তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছে। পুরো ষাটের দশক ধরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা বাঙালির সংখ্যা জাপানে ছিল হাতেগোনা কযেকজন। এর একটি কারণ হলো, দূতাবাসের বাইরে জাপানে যারা আসতেন, তারা প্রায় সকলেই ছিলেন ছাত্র এবং জাপানের সরকারের প্রদত্ত বৃত্তির পূর্ব পাকিস্তানি অংশ থেকে পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে ঢাকার বিহারি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বাছাই করে নেওয়ার বাঙালির সংখ্যা বৃদ্ধির খুব একটা সুযোগ তখন ছিল না। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকেই সেই সময়ে জাপানের অধ্যায়নরত বাংলাদেশী ছাত্ররা বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার অভিযানে নেমে পড়েছিলেন এবং তাঁদের সেই তৎপরতায় যে-দুজন নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলে এস এ জালাল এবং ইসকান্দর আহমেদ চৌধুরী। দুঃখের

Dhaka University Institutional Repository

সঙ্গে বলতে হয়, দুজননেই তাঁরা কিছুদিন আগে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে পরলোকগমন করেছেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত জাপান-প্রবাসী বাঙালিদের স্বাধীনতার পক্ষে চালানো তৎপরতায় শুরুতে সেই সময়ে বাঙালি ছাত্ররা নেতৃত্ব দিলেও পাকিস্তান দূতাবাসের বঙ্গভাষী কর্মকর্তা কর্মচারীরাও নীরবে বসে থাকেননি। যদিও বাঙালি রাষ্ট্রদূত সৈয়দ মোতাহার হোসেন পুরো সময় ধরে সেবা করে গেছেন তাঁর পাকিস্তানি প্রভূকুলের, দূতাবাসের প্রেস আতাশে এস এম মাসুদ এবং দ্বিতীয় সচিব কিউ এ এম এ রহিম নভেম্বরের শুরুতে আনুষ্ঠানিক এবং সংবাদ সম্মেলনে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে পাকিস্তান দূতাবাস ছেড়ে এল জাপান-প্রবাসীদের বিদেশের মাটিতে চালানো মুক্তিযুদ্ধ নতুন এক দিকনির্দেশনা লাভ করে। জাপানের পাকিস্তান দূতাবাসের দলত্যাগী ঐ দুই কূটনীতিকের মধ্যে জনাব মাসুদ ইতোমধ্যে প্রয়াত। আমাদের সৌভাগ্য, সংক্ষিপ্ত আকারে আকারে হলেও কিউ এ এম এ রহিম সেই সময়ের কর্মকান্ডের চমৎকার এক বর্ণনা সম্প্রতি লিখেছেন দৈনিক যুগান্তর। আমরা আশা করতে পারি, জীবনের গৌরবময় সেই অধ্যায়ের স্মৃতিচারণায় তিনি নিয়োজিত হলে তৎকালীন জাপানে বাংলাদেশীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানার সুযোগ আমাদের হবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশে বিদেশে পাড়ি জমানো তরুণ সমাজ শুরুতে জাপান সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠেনি। বিদেশের শ্রমশক্তির জন্যে জাপানে কাজের দুয়ার শক্তভাবে সাঁটা থাকা ছিল এর মূল কারণ। ফলে ভিসা ছাড়া জাপান প্রবেশের সুযোগ থেকে গেলেও জাপানের দিকে বাংলাদেশের তরুণরা তখনো পা বাড়াতে উৎসাহী হয়ে ওঠেনি। বিদেশের শ্রমশক্তির জন্যে জাপানে কাজের দুয়ার শক্তভাবে সাঁটা থাকা ছিল এর মূল কারণ। ফলে ভিসা ছাড়া জাপান প্রবেশের সুযোগ থেকে গেলেও জাপানের দিকে বাংলাদেশের তরুণরা

Dhaka University Institutional Repository

কখনো পা বাড়াতে উৎসাহী হয়নি। সে-রকম অবস্থা বদলে যাওয়ার সুচনা আশির দশকের প্রথমার্ধে।

জাপানের সঙ্গে বিক্রমপুরের সম্পর্কের এই জট খোলাও সহজ নয়, যদিও নবপর্যায়ে এই শ্রমিক-মালিক সম্পর্কে সূচনা খুব বেশি হলে দুই দশকের মতো। জাপান-প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এরকম যে, সৌদি আরব-প্রবাসী বিক্রমপুরের এক সন্তান কীভাবে যেন সেখানে এক জাপানি ব্যবসায়ীর সংস্পর্শে আসার পর এক সময় জাপানে চলে আসেন এবং কাজে নিয়োজিত হন। আশির দশকের শুরুর দিকের ঘটনা সেটি। পরবর্তীকালে সেই পথপ্রদর্শক বিক্রমপুরবাসী তার আত্মীয়-পরিজনদের অনেককে জাপানে নিয়ে আসেন এবং সেইসূত্রে বিক্রমপুরের বেশ বড় ঘাঁটি জাপানে গড়ে ওঠে। সেটি ছিল সেই সময়, বাংলাদেশীদের জাপান ভ্রমণে কেনো রকম ভিসার দরকার যখন হতো না। গত দুই দশকে অবশ্য জাপানে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের লোকজনও এখানে শক্ত হাতে বসে গেছেন। তবে তা সত্ত্বেও আজও কিন্তু জাপানে বসবাসরত বাংলাদেশীদের মধ্যে বিক্রমপুরের সংখ্যাগরিষ্ঠতা চোখে পড়ার মতো। এদের অনেকেই দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের অর্থ দেশে পাঠিয়ে সেখানকার সামাজিক জীবনেও যথেষ্ঠ রদবদল নিয়ে এসেছেন। সেই বিবর্তনের ব্যাপ্তি এতটাই গভীর যে, বিক্রমপুরের বিশেষ একটি গ্রামের নাম এখন হয়ে গেছে জাপানি গ্রাম। জাপান থেকে গ্রামের সন্তানদের পাঠানো অর্থে বাড়িঘর আর দোকানপাট গড়ে ওঠার ফলেই একসময়ের ‘পয়সা’ গ্রামের নতুন এই নামকরণ।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করে জাপানযাত্রী বাংলাদেশীদের সংখ্যা ব্যবপকভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করলে জাপান সরকার ভিসাহীন ভ্রমণের সুযোগ বাংলাদেশীদের জন্য বাতিল করে দিয়ে কঠোর ভিসা ব্যবস্থা চালু করে। ফলে জাপানে জনশক্তি প্রেরণের নামে নতুন এক লোভনীয় ব্যবসার সূচনা ও অনেকটা সেখানে থেকে

Dhaka University Institutional Repository

জাপানে অর্থ উপার্জনের সুযোগের প্রসঙ্গটি যেহেতু ইতোমধ্যে কিংবদন্তিতুল্যে পরিণত হয়েছে, ফলে জাপানে আসতে আগ্রহী তরুণদের সংখ্যার কোনো কমতি বাংলাদেশে একেবারেই নেই। জীবনের কষ্টর্জিত অর্থের সব টাকা ঢেলে দিয়ে হলেও যাওয়ার জন্য এরা উদগ্রীব। আর এদের সেই ব্যকুলতাই অসাধু কিছু ব্যবসায়ীর সামনে খুলে দেয় অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের দুয়ার। প্রায় লাখদশেক টাকা খরচ করে চোরাপথে জাপানে আসা, কিংবা আরো কিছুটা বেশি অর্থ ব্যয়ে ভাষা শেখার স্কুলের নামে জাপানে চলে আসা লোকজনের সংখ্যা যে একেবারে কম, তা কিন্তু নয়। তবে কথা হচ্ছে, যে অর্থব্যয়ে জাপানে এদের আগমন, তা তুলে নেওয়ার মতো নিরাপদ কাজের নিশ্চয়তা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমস্যা-কবলিত জাপানে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে আসতো। তারপরও অবশ্য কোনোরকম কমতি নেই আকালের দেশের স্বপ্নচারী তরুণদের স্বপ্ন দেখে যাওয়ার বাসনায়।

সন্দেহ নেই বর্তমানে জাপানে বসবাসরত বঙ্গভাষীদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠই এসেছেন বাংলাদেশ থেকে। তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগের আবার বৈধ কবাগজপত্র না থাকায় জাপানে বাংলাদেশীদের সঠিক সংখ্যা ঠিক কত, তা নিয়ে মতভেদ অবশ্যই আছে। তবে তারপরও দশ হাজারের কিছু বেশি হচ্ছে অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য এক হিসাব। এদের মধ্যে বলা যায় নব্বই শতাংশ বৈধ কাগজপত্রহীন অবস্থায় কাজে নিয়োজিত। অন্যদিকে জাপান থেকে বাংলাদেশে যাওয়া মোট বৈদেশিক মুদ্রার আনুমানিক পঁচানব্বই শতাংশের উৎস সম্ভবত হচ্ছেন এরা। অবৈধ বাংলাদেশী শ্রমিকের বাইরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্ভবত আবার লেখাপড়া শেষ করে জাপানে থেকে যাওয়ার বাসনায় তাড়িত। এরপরে আছে সীমিতসংখ্যক পেশাজীবী লোকজন এবং জাপানিদের সঙ্গে বিবাহের সূত্রে স্থায়ী বসতির সুযোগ লাভকারী ব্যবসায় নিয়োজত, যার মধ্যে রি-কন্ডিশন্ড গাড়ি বিদেশে পাঠানো হচ্ছে সবচেয়ে প্রচলিত ব্যবসা। এছাড়া রেস্টুরেন্ট এবং হালাল ফুডের ব্যবসার উল্লেখও এখানে অবশ্যই করতে হয়। রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় লক্ষ্য জাপানে লোকজন হলেও

Dhaka University Institutional Repository

হালাল ফুড হচ্ছে শতকরা প্রায় একশ ভাগ বাংলাদেশীদের লক্ষ্য ধরে নিয়ে চালু হওয়া ব্যবসা। পেশাগত দিক থেকে মূলত এরকম কয়েকটি বৃহত্তর কাঠামোয় জাপানের বাংলাদেশীরা বিভক্ত। এর বাইরে নিজস্ব পছন্দ গোষ্ঠী, রাজনৈতিক দল, সামাজিক সংগঠন, আঞ্চলিক সমিতি বেছে নেওয়ার সুযোগ বাংলাদেশীদের সামনে খোলা আছে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির উপস্থিতি চোখে পড়লেও চোখের অনেকটা আড়ালে মসজিদকেন্দ্রিক কর্মকান্ড ঘিরে জামাতের সক্রিয়তার খবর মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের বাইরে বাংলাদেশের অন্য কোন রাজনৈতিক গোষ্ঠী সক্রিয় উপস্থিতি জাপানে নেই, যদিও বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের একক অনুসারীদের উপস্থিতি অনুমান করা যায়।

সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে উত্তরণ এবং স্বপলিপি নামের ভিন্ন দুটি গোষ্ঠীর উপস্থিতি লক্ষণীয়, বাংলাদেশীদের আয়োজনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনার দায়িত্ব মূলত এদের সদস্যদের ওপর এসে পড়ে। সম্প্রতিক সময়ে আত্মপ্রকাশকারী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংগঠন হচ্ছে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, প্রবাসী কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ বণিক সমিতি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই এরা কমবেশি তৎপর।

অন্যদিকে জাপানের লোকজনের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ চর্চা এখন আগের চাইতে অনেক বেশি উৎসাহ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পরিপূর্ণ কোনো কোর্স জাপানে এখনো পর্যন্ত চালু না হলেও টোকিও-ওসাকার বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা শেখার সুযোগ অনেকদিন থেকেই আছে। প্রাথমিকভাবে সেখানে বাংলা শিখে পরে মূলত শান্তি নিকেতন গিয়ে ভাষার ভিত্তিকে যারা শক্ত করে নিয়েছেন, তাদের তালিকাও কিন্তু কোনো অবস্থাতেই কম নয়। এদের মধ্যে তোকাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

Dhaka University Institutional Repository

উসুদা হচ্ছেন জীবনানন্দ দাসের কবিতার জাপানি ভাষার অনুবাদ। অন্যদিকে অধ্যাপিকা কিত্তকো কিওয়া অনুবাদ করেছেন নজরুলের কাব্য ও সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু।

টেকিও এবং ওসাকার বিদেশী ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বেশ কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানও বাংলা ভাষা শেখার ক্লাস নিয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে টোকিওর ওয়াসেদা হোশিয়োনের বিদেশী ভাষা শেখা স্কুল। বেসরকারি পর্যায় সে সব তরুণ স্বেচ্ছাসেবীকে জাপান প্রতিবছর বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, তাদের বাংলা ভাষা শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন মুন্সী আজাদ। এর পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের কাছাকছি জাপানিকে বাংলা ভাষা তিনি শিখিয়েছেন।

বাংলা ভাষায় রেডিও জাপানের অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে ১৯৬২ সাল থেকে এর আগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে রেডিও টোকিও অবশ্য প্রচারধর্মী অনুষ্ঠান প্রচারের নিয়োজিত ছিল। রেডিও জাপানের বাংলা অনুষ্ঠানে জাপানের যেসব লোকজন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাদের মধ্যে অগ্রণী দুই ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন কাযুমা হানাওয়া এবং কাযুহিরো ওয়াতানাবে। কাযুমা হানাওয়া ভার এখন মূলত এসে পড়েছে বঙ্গভাষী জাপানি তরুণী কুমিকো কোগার ওপর।

অন্যদিকে জাপানের যে-কয়টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মকান্ডে সক্রিয়খভাবে জড়িত, সেই দলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় শাপলা নীড়ে'র নাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঠিক পরপর, ১৯৭২ সালে গঠিত এই সংগঠন শুরু থেকেই বাংলা নামকরণের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং বর্তমানে জাপানের এনজিও কর্মকান্ডে যথেষ্ট পরিচিত হয়ে উঠেছে এরা।

Dhaka University Institutional Repository

জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশীরা মূলত দেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসব এবং অন্যান্য বিশেষ দিন পালন করে থাকেন। জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান ঐতিহ্যগতভাবে টোকিওর বাংলাদেশ দূতাবাসের উদ্যোগে আয়োজিত হলেও স্বাধীনতা দিবস, শহীদ দিবস এবং বিজয় দিবসের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোতে একাধিক সংগঠন নিজস্ব অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে। তবে জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশীদের সবচেয়ে বড় উৎসব জাপানে হচ্ছে বাংলা নববর্ষ-উপলক্ষে আয়োজিত বৈশাখি মেলা। আমি টিচার ট্রেনিং প্রাগামে গিয়েছিলাম নববর্ষের দিন ক্লাস করতে গিয়ে আমি বৈশাখী পোষাক পরায় জাপানি শিক্ষকগণ অনেক আনন্দ পেয়েছিলেন গত ছ'বছর ধরে টোাকিওর অন্যতম কেন্দ্রস্তল ইকেবুকুরোর নিশিগুচি পার্কে বসছে মেলার আয়োজন। প্রবাসীদের সকলকেই যেহেতু কর্মব্যস্ত জীবন জাপানে কাটাতে হয়, তাই মেলার আয়োজনে উদ্যেক্তারা পয়লা বৈশাখের নিকটতম রোববারে ছুটির দিনটিকেই সাধারণত বেছে নেন। সকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত পার্কজুড়ে বসে বৈশাখি মেলার সঙ্গে সম্পর্কিত নানারকম আয়োজন। মূল মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলতে থাকার পাশাপাশি বাংলাদেশীদের খুলে বসা বিভিন্ন স্টলে বিক্রি হয় বইপত্র ও খাবার-দাবার থেকে শুরু করে নানারকম সামগ্রী।

জাপানে বাংলাদেশীদের নানারকম অনুষ্ঠান মূলত টোকিও কেন্দ্রিক হলেও জাপানের অন্যান্য এলাকাতেও বাংলাদেশীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। নিইগাতা এবং সন্দোই শহরে আছে ছাত্রদের বেশ বড় কয়েকটি দল। ওসাকা, কিয়োটো এবং কোবের মতো জাপানের পশ্চিম বড় শহরগুলোতে ছাত্রদের পাশাপাশি কর্মজীবী কিছু লোকজনও রয়েছেন।

বাংলাদেশী সমাজের সকলকে একত্রিত করা একক কোনো সংগঠন জাপানে একসময়ে থাকলেও বর্তমানে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মুষ্টিময় কতিপয় স্বার্থন্বেষীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার প্রয়াসের কারণে দেখা দেওয়া সংকট থেকে ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে দূতাবাস ভবনে ধাওয়া পালটা ধাওয়া এবং ব্যালট বাক্স

Dhaka University Institutional Repository

ছিনতাই হওয়ার আলোকে এ সময় বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় জাপানের বাংলাদেশ সমিতি। বলার অপেক্ষা রাখে না, সে-রকম কোনো একচক্ষু সমিতির অভাব জাপান প্রবাসী বাংলাদেশীরা একেবারেই বোধ করছেন না।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে কেন্দ্রীভূত বাংলাদেশী সমাজের মতো জাপানের বাংলাদেশীদেরও রয়েছে বিভিন্ন নিজস্ব প্রকাশনা। আশির দশকের শেষ দিকে হাতে-লেখা দেয়াল পত্রিকা দিয়ে প্রকাশনার সূচনা হলেও পরবর্তিকালে মানচিত্র এবং মাজকুর মতো ছাপার দিক থেকে উন্নতমানের কয়েকটি সাময়িককীও টোকিও থেকে বাংলাদেশীদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় এবং এক সময় যথারীতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসার অবশ্য অনেকটা সংগত কারণেই বিশ্বের প্রায় সব জায়গাতে এ ধরনের প্রকাশনাকে তুলনামূলকভাবে অর্থহীন করে তুলেছে। ঘরে বসে যখন বাংলাদেশেরও আগে প্রতিদিনের বেশ কয়েকটি দৈনিক প্রকাশনা খোলার সুযোগ পাঠকদের হয়, সে-রকম অবস্থায় বাসি, পুরনো খবর-সর্বস্ব সাময়িকী স্বভাবিকভাবেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেওয়ার কথা। ফলে জাপানে বাংলা সাময়িকীর সংখ্যাও এখনো হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দুটিতে। এর মধ্যে বিবেক বার্তা হচ্ছে মিনি সাইজের সাহিত্যনির্ভর সাময়িকী। অন্যদিকে প্রবাসীদের জীবন ও কর্মকান্ডের ওপর নজর দেওয়া দ্বিমাসিক পরবাসের সে-রকম ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই জাপান-প্রবাসীদের মধ্যে জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে পারছে।

জাপানে বাঙালির সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও অন্যদিকে আবার বাংলাদেশ জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভূমিকা কিন্তু খুবই নগণ্য। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জাপানের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কিছু একটা করার দৃষ্টান্ত তেমন খুজে পাওয়া যায় না। একমাত্র ব্যতিক্রম এখানে সম্ভবত হচ্ছেন জাপানে-প্রবাসী শিল্পী কাজী গিয়াসউদ্দীন। টোকিওর বিখ্যাত চারুকলা ও সংগীত বিশ্ববিদ্যালয় তেকে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভের পর

Dhaka University Institutional Repository

জাপানেই তিনি থেকে গেছে এবং অনেকটা ফ্রি-ল্যান্স শিল্পী হয়েও আপনগুণে জাপানের শিল্পের জগতে নিজের স্থায়ী আসন তিনি করে নিয়েছেন সেদিক থেকে কাজী গিয়সিউদ্দিনকে জাপানে বংলাদেশের সবচেয়ে সফল দূত আখ্যায়িত করা যায়। ছবি বিক্রির বাইরেও জাপানের নামী কয়েকটি প্রকাশনা-সংস্থা থেকে বের হয়েছে তাঁর ছবির একাধিক অ্যলবাম।

এর বাইরে সৃজনশীল সাহিত্য, চলচ্চিত্র কিংবা নাটকে জাপানের উপস্থিতি বলা যায় চোখে-না পাড়ার মতো। মূল জাপানির থেকে বাংলা ভাষার অনুবাদ হয়েছে সে-রকম কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব এখনো পর্যন্ত দেখা যায় না, যদিও কয়েক দশকে জাপানি ভাষা জানা লোকজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বেশ কয়েকগুণ। কবিতা তো আরো অনেক দূরের বিষয়। বাংলাদেশে জাপান সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তেমন গবেষণা-গ্রন্থের অভাবের উল্লেখও এখানে একই সঙ্গে করতে হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশে জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগে বাড়ি কেনা, অল্পকিছু দোকান খুলে বসা এবং মুনাফার হিসাব সামনে রেখে চালু করা কয়েকটি হাসপাতালের বাইরে আজও তেমন অগ্রসর হয়নি। ফলে বাণিজ্যের প্রসারেও জাপানে অর্জিত জ্ঞান আমরা যে খুব একটা ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছি, তা তো নয়। তবে আগামীতে সেই পথে নতুন অনেক অগ্রগতি নিশ্চিতভাবেই লক্ষ্য করা যাবে। জাপান এখন আর দূরের কোনো দেশ নয় বলেই সে-রকম আস্থা আগামী প্রজন্মের ওপর আমরা হয়তো নিশ্চিতভাবেই রাখতে পারি[১৮]।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য উৎস

১.ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -৮৭

২. ড.সিদ্ধার্থ গুহ রায়, আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৯৫,

পৃষ্ঠা -২১৬

৩. ড. হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -৮৭

৪.ভিনাক

পৃষ্ঠা-১৭৬

৫.ফেয়ার ব্যাংক

পৃষ্ঠা-৫৩৮

6Nihongo de manabu nihonjijo.
Tokyo,Japan
Page no

Dhaka University Institutional Repository

৭.তোমো (ম্যাগাজিন)

পৃষ্ঠা-৭৫

8. Nihongo de manabu nihonjijo.
Tokyo,Japan
Page no-35

৯.তোমো (ম্যাগাজিন),ঢাকা, প্রকাশ কাল-২০১১,

পৃষ্ঠা-৭৭

১০.তোমো (ম্যাগাজিন), ঢাকা, প্রকাশ কাল-২০১১,

পৃষ্ঠা-৭৬

১১.তোমো (ম্যাগাজিন), ঢাকা, প্রকাশ কাল-২০১১,

পৃষ্ঠা-৭৬

12. . Nihongo de manabu nihonjijo.
Tokyo,Japan
Page no-41

১৩.তোমো (ম্যাগাজিন), ঢাকা, প্রকাশ কাল-২০১১,

পৃষ্ঠা-৭৭

১৪. তোমো (ম্যাগাজিন), ঢাকা, প্রকাশ কাল-২০১১,

পৃষ্ঠা-৭৮

Dhaka University Institutional Repository

১৫.শিননিহোন গো কিছো, জাপান ফাউন্ডেশন

পৃষ্ঠা-৭৬

১৬. The japan book.

Kodansha Intertional ,Tokyo.
Page-52

17 . Nihongo de manabu nihonjijo.
Tokyo,Japan
Page no-154

১৮. তোমো (ম্যাগাজিন), ঢাকা, প্রকাশ কাল-২০১১,

পৃষ্ঠা-৫৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাপানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ধর্মীয় বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি

মেজি যুগের আবির্ভাবে জাপানে আধুনিক রাষ্ট্রোপযোগী অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। মেজি সরকার শিল্প ভিত্তিক আধুনিক পদ্ধতিতে জাপানের অর্থনীতি কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এবং সেই পরিকল্পনা রূপায়নে ও সক্রিয় হন। মেজি পুনর্বাসন জাপানে অর্থনৈতিক বিপ্লব আমন্ত্রণ করে। শোগুন যুগে জাপানের অর্থনীতি ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক। ১৮৭১ সালে প্রথানুযায়ী সম্রাট স্বয়ং আদেশ জারি করে সামন্ত প্রথার অবসান ঘটান।

১৮৭১ সালে জাপানি জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত[১]। জমিদারী প্রথা অবলুপ্তির পর কৃষক জমিদারকে খাজনা দেবার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়। কৃষকরা তখন খাজনা জমিদারকে না দিয়ে দিব্য সরকারকে অবশ্য মেজি সরকারের কৃষি নীতিতে ছিল খাজনা দিতে হবে চাউলের মাধ্যমে নয়, মুদ্রার মাধ্যমে এবং এই খাজনার হার হবে সুনির্দিষ্ট। যার পরিমান উৎপন্ন শষ্যের ১/৩ অংশ আবাদ সুবিধাজনক না হলেও এটি কৃষকদের পরিশোধ করতে হবে। এই নীতি অবশ্য কৃষকদের অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়।

শিল্প

বিত্তশালী বনিক শ্রেনীর আর্থিক সাহায্যে মেজি সরকার শিল্প বিস্তারে অগ্রসর হন। গোড়ার দিকে সরকার বিভিন্ন শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেন। কিন্তু পরে কিছু কিছু শিল্প কয়েকটি পুজিপতি পরিবার গোষ্ঠীকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করেন। এই সব পুজিপতি পরিবার দেশের অর্থনীতির উপর প্রকৃত আধিপত্য স্থাপন করেন এবং এরা জাইবাৎসু নামে পরিচিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মেজি সরকার ভারী তথা হালকা শিল্প গড়ে তুলতে অগ্রসর হন। কেউ কেউ অস্ত্র নির্মান কারখানা গড়ে তোলে। নাগাসাকিতে শোগুনের লৌহ ঢালাই এর কারখানা ছিল। এ সব কিছু মেজি সরকার নিজ অধিকার ভুক্ত করেন এবং দেশের খনিজ সম্পদ জাতীয় সম্পদ ঘোষণা করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে খনি শিল্পে সংশ্লিষ্ট একশত কোম্পানী গড়ে ওঠে। এ সব কোম্পানীর খনি শিল্পে লগ্নী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৯ মিলিয়ন ইয়েন এবং তাদের অধীনে ছিল এক লক্ষ বাহাত্তর হাজার খনিজীবি।

১৮৭৭-১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়লা উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান পরিমান বুঝতে পারা যায়:-

১৮৭৭-৮৪----------০.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন

১৮৮৫- ৯৪---------- ২.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন

১৮৯৫-১৯০৪--------- ৮.০ মিলিয়ন মেট্রিক টন

১৯০৫-১৯১৪--------১৬.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন

১৯১৪---------- ২২.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ক্রয়েন কোম্পানী প্রতিষ্ঠার পর খনিতৈল শিল্পের প্রসার অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ততোধিক তৈলের উৎপাদন এক লক্ষ পিপা এবং ১৯০৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ১.৫ মিলিয়ন পিপা।

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মেজি সরকার পশম শিল্পের উন্নতিকল্পে জার্মান বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে একটি মিল স্থাপন করেন। সেনাবাহিনীর পোষাকের জন্য পশমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যদিও প্রথম দিকে জাপানী তুলা বিদেশী তুলা অপেক্ষা নিকৃষ্ট মানের ছিল। যার কারণে বিদেশী তুলা আমদানী হতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের প্রচেষ্টায় ১৮৮১ এবং ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আরও দুটি তুলা কারখানা স্থাপিত হয়। সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় তুলা শিল্পের উন্নতি ঘটে। রেশম শিল্পের ও উন্নতি ঘটে। হুন্‌শ দ্বীপ ছিল রেশম উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র।

মেজি যুগে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি শিল্পের অগ্রগতির সহায়ক হয়। মেজি যুগে অভ্যন্তরীণ পরিবহনে ব্যয় ছিল অত্যাধিক। যাতায়াতের অসুবিধা দুর করবার জন্য মেজি সরকার রিক্সার পরিবর্তে গতি সঞ্চালক মোটরযান প্রবর্তন করেন, রেলপথ ও নির্মান করেন।

রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৮৭১-১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত :-

১৮৭১ সালে ১২২ মাইল দীর্ঘ

১৮৯৭ সালে ৩০০০ মাইল

কাউন্ট ওকুমার এক বিবৃতি থেকে জানা যায়-

"১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেজি সরকারের মালিকানায় ছিল ৪টি জাহাজ নির্মানের কারখানা, ৫১টি বাণিজ্য জেটি, ৫টি গোলাবারুদের কারখানা, ৫২টি অন্যান্য কারখানা, ১০টি খনি। ১৮৬৮-১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিল্পের এই অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য"[২]।

বৈদেশিক বানিজ্য

শোগুন যুগে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে থেকে দুই শত বৎসরাধিক কাল জাপান পশ্চিম দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় জীবন যাপন করে। ফলে জাপানের সঙ্গে তখন বর্হিবিশ্বের কোন বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

কমরেড পেরির অভিযানের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত কাওয়াগাওয়া সন্ধির পর জাপানের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। ১৮৬৮-১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানে বৈদেশিক বানিজ্যের মোট অর্থমূল্য রৌপ্য ইয়েনের ভিত্তিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেমন ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মূল্য ছিল ২৬ মিলিয়ন ইয়েন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মূল্য বৃদ্ধি পায় ৫০ মিলিয়ন ইয়েন এবং ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ মিলিয়ন ইয়েন।

১৮৮২-৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিকতর থাকায় এ সময় আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে ভারসাম্য জাপানের অনুকুলে থাকে। মেজি যুগে জাপান বিদেশ থেকে আমদানি করত কাঁচা মাল থেকে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি। বিশেষত কার্পাস বস্ত্র, পশমী ও রেশমী বস্ত্র। ম্যানচেষ্টার থেকে সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি আমদানি করা হত। অধিকন্তু আমদানি হত রেল গাড়ীর সাজসরমঞ্জাম, যুদ্ধোপকরণ ইত্যাদি। জাপান রপ্তানি করত মূলত কাঁচামাল, যথা কাঁচা রেশম এবং চা রেশম রপ্তানি হত ইউরোপে এবং চা আমেরিকায়। অতীতে জাপান রপ্তানি করত কুঠীর শিল্পজাত দ্রব্যাদি, যথা মৃন্ময়পাত্র জাপানি কাগজ, লাক্ষন এবং ব্রোঞ্জধাতু নির্মিত পণ্যদ্রব্য।

জাপানে ১৯১৪-১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিল্পে অতগ্রগতির ফলে জাপানে জাতীয় আয় চর্তুগুনের অধিক বৃদ্ধি পায়। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে শিল্প নিযুক্ত শ্রমিকদের সামগ্রিক মুজুরী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মুজুরীর তুলনায় ৫০-৬০ শতাংশ অধিক ছিল। কৃষকদের আয় অবশ্য অনুরূপ বৃদ্ধি পায় নি।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের পর কয়েক বৎসর চাউলের উৎপাদন প্রচুর হওয়ায় ধান-চাউলের মূল্য হ্রাস পায় ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পোন্নতির ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কারখানা প্রথা প্রবর্তিত হয়, ফলে জাপানি সমাজে ভোগ্যবস্তুর আধিক্য দেখা দিলে ও পাশ্চাত্য শিল্পভিত্তিক সমাজের দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করে। এ নীতির ফলে জাপানি সমাজে এক

Dhaka University Institutional Repository

অস্বাস্থ্যকর ও নীতিহীন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অবশ্য এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে তথা ত্রিরিশের দশকে বহুবিধ করের চাপে জনজীবন বিপর্য্যস্ত হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সামগ্রিক শিল্পোৎপন্ন মাত্র ০.৩৮ শতাংশ ছিল ভারী শিল্প কিন্তু ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ভারী শিল্পের উৎপাদনের পরিমান দাড়ায় ৭২-৭৩ শতাংশ। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারী শিল্পের অন্তর্ভুক্ত মোটর যানের বাৎসরিক উৎপাদন ছিল মাত্র ৫০০টি কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক উৎপাদন দাড়ায় ৪৮,০০০টি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সকল প্রকার বিমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০টি কিন্তু ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিমানের সংখ্য বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৫,০০০ টি।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমান বিষ্ফোরক দ্রব্য উৎপন্ন হয় জাপানে তখন বিষ্ফোরক দ্রব্যেও উৎপাদন হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে নির্মিত হয় ৯২,০৯৩ টন ওজনের বাণিজ্য জাহাজ কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্য জাহাজের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৪,০৫,১৯৫ টন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রণতরীর মোট ওজন ছিল ১৫,০৫০ টন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন রণতরীর মোট ওজন দাড়ায় ২,৩১,৯৯০ টন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের অর্থনীতি সামরিক নিয়ন্ত্রণের অধীন হয়। সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের ও স্বাভাবিক কারণে ব্যয়ের অংক বৃদ্ধি পায়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর জন্য মোট বাজেট নির্ধারিত ছিল ৪৩৪ মিলিয়ন ইয়েন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই বাজেট বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ৭,২৬৬ মিলিয়ন ইয়েন।

এরূপ আর্থিক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহন ব্যতীত উপায়ান্তর থাকে না। ৩১ শে মার্চ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় অপরিশোধ্য ঋণের অংক দাঁড়ায় ৩১,০৭৮ মিলিয়ন ইয়েন। দশ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৩১ শে মার্চ ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় অপরিশোধ্য ঋণের পরিমান ছিল ৬,৮১৯ মিলিয়ন ইয়েন।

Dhaka University Institutional Repository

ঘাটতি রাজস্ব ও জাতীয় ঋণ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে জাপান সরকার ব্যাংক সম্প্রসারনের নীতি গ্রহন করে। এই নীতি ছিল সকল শ্রেনীর জনগণকে ব্যাংকে অধিক পরিমাণে আমানত গচ্ছিত রাখতে উৎসাহিত করা। গচ্ছিত আমানতের পরিমান বৃদ্ধি পেলে একদিকে যেমন সরকারের পক্ষে বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহন না করেই যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করা সহজসাধ্য হবে, অন্যদিকে তেমনি দেশে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা বহুলাংশে দূরীভূত হবে। ১৯৩০-১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ বানিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ৭৮২ থেকে ১৮৬ তে হ্রাস পেলে ও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোতে গচ্ছিত আমানতের পরিমান ৮.৭ মিলিয়ন ইয়েন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ২৯.৮ মিলিয়ন ইয়েন। ব্যাংক সিকিউরিটির পরিমাণও ০.৯৪৯ মিলিয়ন ইয়েন থেকে ৫ বিলিয়ন ইয়েন বৃদ্ধি পায়[৩]।

জাপান সরকার আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে পার্থক্যজনিত প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করবার উদ্দেশ্যে তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন।

১। বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলের বর্ধিত হতে সদ্ব্যবহার,

২। অপ্রয়োজনীয় আমদানি হ্রাসকরন এবং

৩। স্বর্ণভান্ডারে অধিকতর পরিমাণে স্বর্ণ সঞ্চিত করা।

এই তিনটি পন্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বাণিজ্যে প্রতিকূল অবস্থা রোধ সম্ভব হয় না। আমদানী যথা পূর্ব রপ্তানিকে অতিক্রম করে চলে। কাঁচামালের চাহিদার আধিক্য হেতু এবং ভবিষ্যতের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ করে রাখার প্রবনতা হেতু। এরূপ পরিস্থিতির প্রতিবিধানের জন্য সরকার দুটি ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

১। বিনিময় মুদ্রার সঞ্চিত তহবিলের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সাধন এবং

২। বিশেষ কিছু দ্রব্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ।

অধিকন্তু বিনিময় মুদ্রা নিয়ে ফটকা, মূলধন রপ্তানি, বিদেশে মুদ্রা প্রেরন, বিনামুল্যে রপ্তানি এ সমস্ত ও নিয়মাধীন করা হয়। আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপনের প্রণালীও প্রবর্তিত হয়। স্থির হয় যে সরকার কোন নিদির্ষ্ট পরিমাণ আমদানি অনুমোদন করবেন এই শর্তে যে, কোন নিদিষ্ট পরিমাণ রপ্তানি উক্ত আমদানিকে ন্যায় সঙ্গত প্রমাণিত করবে। এই ভাবে কাঁচামালের আমাদানির সঙ্গে রপ্তানির প্রয়োজনীয়তার একটি কড়া সর্ম্পক স্থাপিত হয়। সেই প্রথমে উল্লেখযোগ্য যে বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র যেমন কর ধার্য করে যুদ্ধব্যয় সংকুলানের পক্ষপাতি ছিল। জাপান সেরূপ ছিল ন। জাপান সরকার সরকারী বন্ড বা প্রতিজ্ঞাপত্র ক্রয়ের জন্য ও জনগণের উপর চাপ সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন না।

ফলত জাপানে বন্ড ক্রয়ের কোন ঐতিহ্য ছিল না। জাপানি সরকার কর ধার্যের একটি কাঠামো স্থির করেন। যুদ্ধব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে নয়, বে-সমরিক ব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে। বন্ড ক্রয়ের উপর গুরূত্ব আরোপ না করে জাপানি সরকার জাপানের ঐতিহ্য অনুসারে ব্যাংকে আমানত বৃদ্ধির উপর গুরূত্ব আরোপ করেন।

উপরোক্ত সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বে ও জাপানি সরকার যুদ্ধকালীন অর্থনীতিতে স্থিরতা প্রবর্তনে সক্ষম হন নি। আয় অপেক্ষা ব্যয়ের আধিক্য ঘটে। ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যয়ের অনুপাতে আয় ছিল ৭৪ শতাংশ। ১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যয়ের উপর উত্তরোত্তর অধিকতর নির্ভরশীল হতে হয়।

যুদ্ধ চলাকালীন জাপান সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের একটি তালিকা দেয়া হল :- (বিলিয়ন ইয়েন)

আর্থিক বৎসর	মোট রাজস্ব	মোট ব্যয়	ঘাটতি
১৯৪১-৪২	৫.৮	১৯.২	১৩.৪
১৯৪২-৪৩	৯.৮	২৪.৭	৪.৯
১৯৪৩-৪৪	১৩.৪	৩১.১	১৮.৭
১৯৪৪-৪৫	১৮.৫	৭৭.৬	৫৯.১
১৯৪৫-৪৬	২৭.২	১০৩.৮	৭৬.৬

এ ঘাটতির ফলে যুদ্ধকালে জাপানি সরকারের ঋণভার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়[৪]। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা দেওয়া হল -

468263

আর্থিক বৎসর	মোট ঋণ (মিলিয়ন ইয়েন)
১৯৪০	২৩.৬২৫
১৯৪১	৩১.০৭৮
১৯৪২	৪১.৭৮৪
১৯৪৩	৫৭.০০৫
১৯৪৪	৮৫.১১৩

অতিরিক্ত জাতীয় ঋণ এবং ঘাটতি ব্যয় জাপানের পরাজয় অনিবার্য করে তোলে। যুদ্ধ শেষে জাপানের অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। উৎপাদন তখন বন্ধ প্রায়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবন ধারনের মান তখন অতীব নিম্ন স্তরে। চর্তুদিকে ধ্বংসের স্তুপ। জাপানের আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত আর কিছু করনীয় ছিল না।

এ অবস্থা থেকে জাপানের উদ্ধার সম্ভরপর হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের সাহায্যে। যুদ্ধ শেষ হয় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সাহায্য শুরু হয় ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে। যখন শহরাঞ্চলের জনগণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ৪০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আরও ২ বিলিয়ন ডলার অনুদান করা হয়। মুদ্রাস্ফীতির জন্য বৈদেশিক ব্যবসা মন্দাগতিতে অগ্রসর হয়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করবার উদ্দেশ্যে ম্যাকথার্রে ও সামরিক সরকার জাপানিদের জীবনধারণ প্রণালীতে কঠোরতা পালনের নির্দেশ দেন।

465263

ইতিমধ্যে দ্রব্যদির মূল্যহ্রাস, রপ্তানি ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকুল হয়। যুদ্ধোত্তর যুগে কোরিয়ার যুদ্ধ চলাকালে (১৯৫০-৫৩) জাপানের সর্ব প্রথম অধিক পরিমাণে শিল্পোৎপাদন শুরু হয়। তখন জাপান ৪ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সামরিক সাজসরঞ্জাম সরবরাহের নির্দেশ পায়। ফলে জাপান শিল্পোৎপাদন যেন পুনর্জীবন লাভ করে। অবশেষে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পর দশকের গোড়ার দিকে জাপান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুনরায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

১৯৫১-১৯৬১ দশকের বর্হিবিশ্বের সঙ্গে জাপানের প্রসার ঘটে। এই দশ বৎসরের জাপানের আমদানি রপ্তানির বহর নিম্নরূপ ছিল।

আর্থিক বৎসর	রপ্তানি	আমদানি
১৯৫১ মিলিয়ন ডলার	১.৩৪৫ মি. ড.	১.৯৯৫ মি. ড.
১৯৫৩ ” ”	১.২৭৪মি. ড.	২.৪০৯ মি. ড.
১৯৫৫ ” ”	১.০১০মি. ড.	২.৪৭১ মি. ড.
১৯৫৭ ” ”	২.৮৫৮মি. ড.	৪.২৮৩ মি. ড

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৯	"	"	৩.৪৫৬মি. ড.	৩.৫৯৯ মি. ড.
১৯৬১	"	"	৪.২৩৫মি. ড.	৫.৮১০ মি. ড.

এ তালিকা থেকে বুঝা যায় যে, ১৯৫১-১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানের রপ্তানি অপেক্ষা আমদানি ছিল অধিকতর। ১৯৭০ সাল নাগাদ জাপানি শিল্পে অগ্রগতির ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট তৃতীয় শক্তি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

অ্যালেন প্রদত্ত তথ্যানুসারে ১৯৪৫-১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কতকগুলো সুস্পষ্ট পর্যায় চিহ্নিত করা যায় :-

১। আগষ্ট ১৯৪৫- ফেব্রুয়ারী ১৯৪৯ :

এই সময় জাপানের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান থাকে। তখন জাতীয় সঞ্চয় ছিল নগন্য এবং মন্দাতিতে বিরল।

২। মার্চ ১৯৪৯ জুন ১৯৫০ :

এই সময় জাপানের অর্থনীতিতে নিশ্চলতার কাল।

৩। জুন ১৯৫০ নভেম্বর ১৯৫৩ :

এই সময় কোরীয়া যুদ্ধের ফলে জাপানের অর্থনীতিতে সতসা উন্নত অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৪। নভেম্বর ১৯৫৩- ডিসেম্বর ১৯৫৪ :

এই সময়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রপ্তানিও বৃদ্ধি পায়।

৫। জানুয়ারী ১৯৫৫- মার্চ ১৯৫৭ :

এই সময় জাপানী অর্থনীতির সর্বস্তরে দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়[৫]।

Dhaka University Institutional Repository

এ্যালানের মতে,

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান হয়, একথা বলা যেতে পারে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের অর্থনীতিতে অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬১-১৯৭১ দশকে জাপানি সরকার আয় দ্বিগুণ করবার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এরফলে শিল্পপতিগণ যথেষ্ট উৎসাহ পান এবং শিল্পোকরন উৎপাদনে যথেষ্ট মূলধন বিনিয়োগ শুরু করেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনীতিতে এই বিস্ময়কর অগ্রগতির কারণ মূলত:

প্রথমত:

যুদ্ধোত্তর যুগে জাপানের অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের অবদান অনস্বীকার্য, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্থিক অনুদান এবং জেনারেল ম্যাকার্থারের ভুমি সংস্কার জাপানের অর্থনৈতিক পুনরুত্থান সম্ভাব্য করে তোলে।

দ্বিতীয়ত:

কোরিয়ায় যুদ্ধ (১৯৫০-১৯৫৩) জাপানের শিল্পোৎপাদনে, বিশেষত সামরিকসাজসরঞ্জাম উৎপাদনে যথেষ্ট প্রেরণা দান করে ফলে শিল্পোৎপাদন সম্প্রসারিত হয়।

তৃতীয়ত:

উৎপাদনশীল ও উচ্চমানের শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব জাপানের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারক[৬]।

Dhaka University Institutional Repository

সমসাময়িক অর্থনীতি

যুক্তরাষ্ট্রের পরে জাপান হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক বাজার। ২০০০ অর্থবর্ষে জাপানের GDP-এর হার ছিল ৫৩৫.৭ এবং ১৯৯৯ সালে ২৯ OECD দেশের মধ্যে গড় মাথাপিছু আয়ের দিক দিয়ে তৃতীয় অবস্থানে এসেছিল। সঠিক বৃদ্ধির হারে প্রায় তিন দশক পরে জাপানের অর্থনীতি ১৯৯০ সালে চরম উন্নতির পর্যায়ে এসেছিল যা কিনা দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রায় অনেক সময় পর। যুদ্ধ পরবর্তি সময়ের প্রায় ৫০ বছর জাপানের অর্থনীতির চিত্র চরম দুরবস্থা যা কিনা তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চরম অন্তরায় ছিল। জাপানী মানুষের পরিশ্রমের দ্বারা আদর্শ পণ্য উৎপাদনের জন্য গণ-অনুশীলনের মাধ্যমে তারা অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি এবং আরো অনেক বৈপ্লবিক পণ্য সমূহের উৎপাদন শুরু করে যা কিনা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিযোগীতামূলক। যা হোক যেহেতু বিশ্ব অর্থনীতির দৃষ্টিপাত চলে গিয়েছিল সফটওয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি ও অন্যান্য বৈচিত্রতার দিকে, জাপানের প্রয়োজন হয় তাদের অর্থনৈতিক গতি ধারায় পরিবর্তন আনার, বিংশ শতাব্দির অর্থনৈতিক ধারাকে গতিশীল করার জন্য জাপানী সরকার নজর দেয় অর্থনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামোর উপর, অর্থনৈতিক নিয়মতান্ত্রিকতার উপর এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতির স্বাধীনতার উপর। বর্তমান অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে ব্যাংক জালিয়াতি লক্ষ করা যায় এবং এটা প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চলতে থাকে। বড় বড় উৎপাদিত শিল্প কারখানাগুলি পূর্ণগঠিত হচ্ছে নতুন ভাবে[৭]।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনের যুগ

নতুন সন্ধিক্ষণের শেষের দিকে ১৯৫২ সালে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে এক পঞ্চমাংশ গড় মাথাপিছু আয় দেখিয়ে অনুন্নত দেশ হিসাবে স্থান পায়। ১৯৫৩-১৯৭৩ এই সময়ের মধ্যে জাপানের অর্থনৈতিক গতিদ্বারা দ্রুত উন্নতির পর্যায়ে আসে এর মধ্যে ১৯৬০ সালে প্রত্যেক অর্থ বছরে মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ৮.০%-১০.৬%। ১৯৬০ সালের চেয়ে ১৯৭০ সালের সত্যিকারের গড় মাথাপিছু আয় ছিল ২.৫ (আড়াই) ভাগেরও বেশি এবং ১৯৬৮ সাল জাপান বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই দ্রুত উন্নতি বৃদ্ধি জাপানের শিল্পকারখানার উপর তাৎপর্যপূর্ণ ও গঠনগত পরিবর্তন এনেছিল। উন্নতি ধারা পরবর্তিতে হয়েছিল কৃষি কাজ এবং অতি উৎপাদনের দিক থেকে শুধুমাত্র ভারি শিল্প কলকারখানা এর উপর চলমান বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ কর্মকান্ডের দিকে। শহরায়ন চলতে থাকে দ্রুত গতিতে। প্রথমত প্রধান বৃদ্ধি ছিল Iwato Boom, (১৯৫৯-১৯৬১) গড় উৎপাদন ১২.২% যা হারিয়ে গিয়েছিল একটা বিনিয়োগ বর্ষকে এবং ১৯৬১ সালে এর হার ১৪.৫% এ পৌছে গিয়েছিল। পুনরায় বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৯৬৩-৬৪ সালে (১১.৮%), ১৯৬৬-৭০ (১১.৬৭) যার নাম ছিল Izanagi Boom (১৯৫৯-১৯৬১), গড় উৎপাদন ১২.২% যা ছাড়িয়ে গিয়েছিল একটা বিনিয়োগ বর্ষকে এবং ১৯৬১ সালে এর হার ১৪.৫% এর পৌঁছে গিয়েছিল। পুনরায় বৃদ্ধি ঘটেছিল ১৯৬৩-৬৪ সালে (১১.৮%) ১৯৬৬-৭০ (১১.৬৭%) যার নাম ছিল Izanag, Boom এবং ১৯৭২-৭৩ (৪.৯%) যার নাম ছিল Tanaka Expassion অনেক ধরনের উৎপাদনকারীরা এই দ্রুত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রেখেছিল যাদের মধ্যে সর্বনিম্ন আয়ের লোক থেকে সবর্বোচ্চ আয় করে। তবে নিম্ন আয় ও উৎপাদন কারিদের প্রচেষ্টা ছিল খুবই জোরালো। পাশাপাশি, শিক্ষিত এবং দক্ষ লোকের প্রচেষ্টা ও খুব বেশি। আরো বলা যায় ক্ষুদ্র অর্থনীতিক

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন পন্থা উন্নতিকে বেগবান করে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে পন্যের সহনীয়মূল্য এবং প্রসার বিনিয়োগ বাণিজ্য দ্বারা দারুনভাবে আর্শিবাদপুষ্ঠ হয়েছিল ভাল প্রযুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে জাপানের উন্নতি চরম গতিতে এগিয়ে চলে।

জাপান ১৯৫২ সালে IMF-এর সদস্য হয় এবং ১৯৫৫ সালে GATT, ১৯৫০ সালের মধ্যে স্বাধীন বাণিজ্যকে মূল্য দিয়ে IMF এর মূল অনুচ্ছেদের ৮ম অবস্থানে আসে এবং OECD-তে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সকল স্বপ্ন বাস্তবায়ীত হয় ১৯৬৪ সালে। মূল্যসংযোজন কর এবং মূল্য নির্ধারন নিয়ন্ত্রণ ১৯৭০ সালে দুর হয়ে যায়। এবং কৃষিকাজের ও উন্নতি প্রযুক্তির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে ১৯৮০ সালে করহীন বাঁধাবিপত্তি গুলি দুর হতে থাকে এবং আলোচিত হতে থাকে, বিনিয়োগ ও ঋণ এর উপর এবং আন্তর্জাতিক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মাধ্যমেই তা বাস্তবায়িত হয়।

অনেক শিল্পকারখানাই সরকারের প্রিয় প্রতিষ্ঠান হয়েছিল এবং এটা অস্পষ্ট যে কোন একটি কোম্পানি আরেকটি কোম্পানি থেকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে ছিল। বিদেশি ফার্মগুলো দ্বারা বেশির ভাগ সময় দেশি নিয়ম নীতির প্রশংসা করেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

১৯৫০ সাল থেকে ব্যাংক ব্যবস্থা ধীরে ধীরে পূর্ণগঠিত হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে স্টক এক্সচেঞ্জ পুনরায় চালু হয়েছিল কিন্তু এটা ১৯৮০ সালের স্টক এক্সচেঞ্জ আগে প্রধান Fund এর উৎস হিসাবে উন্নতি হয় নি, সঙ্গবদ্ধ অর্থ ব্যবস্থা নির্ভর করে ব্যাংকের অর্থনৈতিক লেদেনের ব্যবস্থার উপর যা বিবেচিত হয় তা অতিরিক্ত তহবিল হিসাবে। অতিরিক্ত তহবিল নেয়া বন্ধ করতে বিভিন্ন ফার্ম সমূহের সরকার

Dhaka University Institutional Repository

Cross-Share-holding গুলো খুঁজে বের করে এবং তা প্রতিরোধের উদ্যোগ নেয় বিশেষ করে Enterprise Group-গুলো keiretso এর তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই সময়ে ছোট এবং মধ্যম আকারে শিল্প সঙ্ঘগুলো গুরুত্বপুর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে[৮]।

১৯৫০ সালে প্রধান রপ্তানিকারকেরা অবস্থান করে নেয় বিভিন্ন বুনন শিল্প এবং আলোক শিল্প কারখানাগুলোতে যাদের পন্যগুলো বাজারজাত করা হত বিভিন্ন সাধারণ ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান গুলো কর্তৃক। যা হোক সরকারের শুভ দৃষ্টিপাত পারে উপকুলি অঞ্চলের বড় বড় ভারি উৎপাদনশিল্পের ভবনগুলোর দিকে ১৯৬০ সালের দিকে বড় বড় রাসায়নিক শিল্পগুলোকে অনুসরন করে লোহা এবং ইস্পাত শিল্প সমূহ শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং ১৯৭০ সালের শুরুতে বিদ্যুত শিল্প ও মোটরগাড়ী শিল্প ১৯৭০ এর শেষের দিকে প্রসিদ্ধ লাভ করেছিল। ১৯৫০ সালের পুরোটা সময় রপ্তানি প্রক্রিয়া এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতি জাপান উন্নতির স্রোতধারা বেগবান ছিল।

১৯৬০ সালের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জাপান মুখোমুখি হয়েছিল পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার ভারসাম্যহীনতায় এবং এটা ছিল দীর্ঘস্থায়ী একটা সমস্যা। সবশেষে তুলনামুলকভাবে মুদ্রাস্ফীতির সমস্যাও দেখা দিয়েছিল বড় আকারে।

অন্যদিকে পরিবেশ দুষণ এবং এই দুষণের ফলে সৃষ্ট বিভিন্ন খারাপ রোগ সমূহের বিস্তার ঘটে যা ছিল প্রায় অপ্রতিরোধ্য। ১৯৬০ সালের পুরোটা সময় এই

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যায় জরজরিত হয়েছিল। বিশেষ করে পারদ ও ক্যাডমিয়ান এক প্রকার সাদা ধাতব পদার্থ এর মারাত্মক বিষের দূষণে দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইন দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

পরিপক্ক অর্থনীতিঃ

১৯৭৩ সালের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়সমূহ যা দ্রুত উন্নতির সাথে জড়িত যেগুলো তাদের শক্তি ও বৃদ্ধির হারাতে থাকে। প্রথমত অতীতের চেয়ে ভালমানের পন্য উৎপাদনের জন্য তারা বিশেষভাবে বিদেশীদের দ্বারা প্রশিক্ষিত হয়েছিল। এই বিষয়গুলো নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লাভের পরিমানটা কমিয়ে দিয়েছিল এবং এটা ঘটেছিল এভাব নেমে আসে শুধুমাত্র বিপ্লব ও যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্যবসায়ের কারণ ধরে। জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৬৯ সালের বুনন শিল্পের কথা বলে। প্রথমত তারা বলে যে ১৯৭৩ সালের চুতুর্মুখী তেলের দাম শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছেগিয়েছিল যখন তেলের তীব্র সংকট ছিল।

এমনকি ১৯৭৩ সালের October মাসের তেল সংকটের সময় জাপানি সরকার অর্থনীতিকে ধীরগতি সম্পন্ন করতে চেয়েছিল শুধুমাত্র মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার কারণে। চতুর্মুখী তেলের মূল্যবৃদ্ধির সাথে যুক্ত হয়ে জাতীয় সামগ্রিক উৎপাদন (GNP) হঠাৎ করে নিম্ন মুখী হয়ে পড়েছিল এবং ১.৪% এর নিচে ছিল। ১৯৫০ সালের পর এটাই প্রকৃত অর্থনৈতিক হ্রাস। তৃতীয় বারের মত ১৯৭১ সালে, দ্বিতীয় বারের মত ১৯৮৮ সালে এবং প্রথম বারের মত ১৯৮৪ সালের Plaza Accord" অনুযায়ী Yen-এর মূল্য বৃদ্ধি পায় চরমভাবে যার পরিমান ছিল ১২০US-doller. যার ফলে ১৯৮৬ সালে বাণিজ্যের উর্ধ্বগতি পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে গৃহস্থ কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল এই অর্থনৈতিক মন্দাকে

Dhaka University Institutional Repository

কাটিয়ে উঠার জন্য। আর্থিক নীতিমালা চারবার সহজতর পর্যায়ে এসেছিল ১৯৮৬ সালে কারণ জাপান ব্যাংক ছাড়ের হার ৫.০% থেকে ২.৫% এ কমিয়ে এনেছিল এবং এই পর্যায়টা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে নিচু পর্যায়। ১৯৪৬ সালে ভোগের পরিমাণ বাড়তে শুরু করে এবং ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিনিয়োগের মালিকানা পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রকৃত পক্ষে সঙ্গবদ্ধ বিনিয়োগ বেড়েছিল ১৯.৫%। এটা অগ্রিম করছিল ১৯৮৯ সালের কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি খাতের পুরো বিনিয়োগকে, শুধুমাত্র সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা এবং মূল্যবৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে।

১৯৬১ সালের Tokyo বাজারে হঠাৎ ভাঙ্গণে নতুন উচ্চ মজুদ মুল্য প্রথমবারের মত অতিগুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য, ব্যাংকগুলো Real state ব্যবসায় উন্নতির জন্য নতুন নীতিমালার পথ খুঁজে পায়। এ সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো Real state ব্যবসাকে পাশাপাশি একটা Stock market ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাদের পণ্যের মান বজায় রেখে উৎপাদনের উপর চরম গুরত্ব দিয়েছিল। ১৯৪৬-১৯৮৯ সালের তথাকথিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বলা হত bubble economy যাতে করে জমির দাম বেড়ে গিয়েছিল প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি এবং শেয়ার বাজারের সুচি বেড়েছে ২.৭ হারের ও বেশি।

ইতোমধ্যে জাপান ১৯৮৯ সাল থেকে শুরু হওয়া সকল আর্থিক নীতিমালার উপর কড়াকড়ি আইন ছিল। ফলে উচ্চ সুদের হার হঠাৎ করেই পড়ে যায়। ১৯৯০ সালের সর্বোচ্চ হার থেকে ১৯৯৩ সালের জাপানে জমির মূল ৪৯.৩ ভাগ পড়ে গিয়েছিল এবং জাপানের প্রধান ব্যাংকগুলোর ঋণগ্রহিতা বেড়ে গিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সংস্থা অনুযায়ী Heisei Recession শুরু হয়েছিল ১৯৯১ সালের April মাস থেকে এবং শেষ হয়েছিল October, ১৯৯৩ সাল থেকে অর্থনৈতিক ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার গতি অনেক বেশি কমে গিয়েছিল। পরবর্তী উপরের দিকের ভরবেগ প্রভাবিত হয়েছিল নেতিবাচক প্রভাব দ্বারা যেমন এশিয়ার অর্থনীতি টানাপোড়ন এবং বিভিন্ন বড় বড় অর্থনেকি প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাংক বিচ্ছেদ এবং ১৯৯৮ সালে ১.১ মাত্রার নেতিবাচক উন্নতির ব্যর্থতা এবং এর জন্য জাপানের পূর্ববর্তি বছরের (১৯৯৭ সালের অর্থনৈতিক মন্দার) IT পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং এশিয়ার অর্থনেতিক উদ্ধার তৎপরতা দ্বারা অতিরিক্ত উন্নয়নের চাহিদা এবং শক্ত যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ইত্যাদি কারণে সরকারের জরুরী ব্যয় প্রকল্পের দ্বারা সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে ১৯৯৯ সালে জাপান কতকগুলি উন্নতির উপায় খুঁজে পায় এবং সেই অনুযায়ী ০.৮% হারে ছোট মাত্রার উন্নতি অর্জন করে, একুশশতকের শুরুতে জাপানের অর্থনৈতিক চাবিকাটির রপ্তানি বাজার ও যুক্তরাষ্ট্র ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং একক ভোক্তা হিসাবে পরিণত হয় যা প্রায় ৬০% দেশীয় চাহিদার একটা অংশ এবং এভাবেই অনেক বছর জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা একই থাকে ।

আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং কর

জাতীয় সরকারের Account দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এটা হল সাধারণ Account আর ২য় টি হল বিশেষ Account, এই সকল Account পুরাতন সবাইকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল যা জাপান এর অর্থব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখে। এভাবে বাজেট বলতে বোঝাতে সাধারণ Account এর বাজেট। পহেলা এপ্রিল থেকে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত জাপানের অর্থবছর চলতে থাকে। জাতীয় কর রাজস্ব সাধারণ Account এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটা ছোট্ট কর রাজস্বের অংশে বিভক্ত হয়ে যা সরাসরি বিশেষ Account এর অন্তর্গত। কর এবং Stamp রাজস্ব একত্রে গঠন করেছিল সমস্ত আয়ের প্রায় ৬০%। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত জনগণের চুক্তি নীতি বাধাগ্রস্থ ছিল নির্মাণ চুক্তির কাছে।

Dhaka University Institutional Repository

যা হোক ১৯৭৫ সালের বিশাল চুক্তির বিষয়গুলো বাজেটের ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে খুবই জরুরী হয়ে পড়েছিল। অন্যান্য রাজস্বগুলো আসত সরকারের বিভিন্ন সম্পত্তি বিক্রি বা লেনদেন থেকে।

বিশেষ Account প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আইন দিয়ে যখন, সরকার চালিয়ে যায় নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচির কাজ Fy ২০০০ সালে ৩৮টি বিশেষ Account ছিল এবং এর প্রত্যকটির এক একটি বিশেষ Account ছিল যেমন সাধারণ Account থেকে স্থানান্তর করা Account, বিশেষ Account যার ছিল বিভিন্ন ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক প্রামান্য পত্রাদী এবং সামাজিক Insurance অবদানের Account কিছু বিশেষ Account এর রাজস্ব অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বাজেট সমুহ Diet দ্বারা অনুমোদিত থাকতে হত।

জাপানী কর পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রত্যক্ষকর । ফলে ৬০%কর আসত প্রত্যক্ষকর থেকে এবং ৪০% আসত পরোক্ষ কর থেকে এবং প্রত্যক্ষকর যে দুই ভাগ বিভক্ত করা যায়। প্রথমটা হল আয়কর আইনের দ্বারা সজ্ঞায়ীত উন্নয়নমুলক বিশেষ আয় কর এবং দ্বিতীয় হল প্রাতিষ্ঠানিক কর যা প্রতিষ্ঠানিক আয় কর আইন দ্বারা সজ্ঞায়ীত ৩০% ভোগের একটা আয়কর আইন পরিচিতি লাভ করেছিল ১৯৮৯ সালের দিকে কিন্তু ৫% ভোগের নিয়ম করা হয়েছিল ১৯৯৭ সালে। এই ভোগের আয়কর পুরো পরোক্ষ আয়কর ওজন কে সাম্প্রতিক বছরগুলেতে বাড়িয়ে তুলেছিল[৯]।

সরকার জাতীয় ভাবে Tax আদায় শুরু করল Local ভাবে আদায় না করে যাতে করে জাতীয় রাজস্ব খাত থেকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণ রেখে চলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজস্বখাতে গঠনগত সংস্কারঃ

১৯৯০ সালে সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ঋণ বেড়েই চলছিল। ১৯৯৭ সালে রাজস্ব সংক্রান্ত গঠনগত সংস্কার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতে প্রস্তাব রাখা হয় ২০০৩ সালের মধ্যে সরকার এবং লোকাল GDP এর হার ৩% এ কমিয়ে আনতে। ১৯৯৯ সালে প্রস্তাব রাখা হয় যে, সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গড় ব্যয় ২% এর বেশি হবে না।

১৯৯৮ সালে রাজস্ব সংক্রান্ত গঠনগত সংস্কার চুক্তি পাস হয়। যার ফলে সরকার বিভিন্ন ভাবে Tax কমিয়ে আনে এবং জনশক্তির উপর জোর দেয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে। এর ফলে জাপানের অর্তনীতিতে হঠাৎ করে বড় ধরণের ভারসাম্য চলে আসে।

আত্মদায়িত্বপুর্ণতাকেই কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক বাজার কে বিশ্বময় তুলে ধরতে জাপান সরকার অর্থনীতির উপর পূনরায় প্রচন্ড নিয়ন্ত্রণ শুরু করে। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশি বিদেশী প্রতিষ্ঠান এর উপর সরকারের ভাল নিয়ন্ত্রণ ছিল। এর পরবর্তিতে ১৯৪৫ এর প্রতিষ্ঠা লাভ করে Japan Tobaco Inc, (NIT) Nippon Telegraph and Telephone corporation. ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে Japan Railways (JR). Group এর পর জাপানের অর্থনীতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে যা Japanese Big Bang নামে পরিচিত। এ সময় জাপানের সাথে অনেক বিদেশী কোম্পানির আর্থিক লেনদেন ও বিনিময় শুরু হয়। এরপর ১৯৯৫ সালে Plan to promote Deregulation, The three year Program for Promoting Deregulation (১৯৯৮) এবং New three year program (২০০১) সালে প্রতিষ্ঠিত হয়[১০]।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় আয়

১৯৯৯ সালে জাপানের জাতীয় আয় ছিল ৩৮৩ মিলিয়ন। অর্থনীতির গতিধারা কমে যাওয়ায় পূনরায় অস্থিরতা শুরু হয়। ১৯৯৯ সালে, ১৯৯৮ সালের ঋণ পড়ে গিয়েছিল ১৯৯৫ সালের গণনা অনুযায়ী[১১]।

এসময় অতীতের বিভিন্ন দশকের চেয়ে চাকুরী জীবিদের হার বেড়ে গিয়েছিল। ব্যক্তি মালিকানা ও পুজিবাদি প্রতিষ্ঠান গুলোর আয় কমতে থাকে। ১৯৭০ সালের চাকুরিজীবিদের ক্ষতিপূরণ দাড়ায় ৫৪.৫% এবং পুঁজিবাদীদের ক্ষতিপূরণ দাড়ায় ৩৭.১% । ১৯৯৯ সালে এই তালিকা হয় যথাক্রমে ৭২.৫% এবং ২৩৪%।

পরিশোধ এর ভারসাম্য

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আবাসিক, অনাবাসিক বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যমূল্য ও সেবার সেই সাথে পুঁজিবাদী আয় ও ব্যয়ের হিসাব কে Balance of payment বলে।

জাপানের বর্তমান Account Balance এর তারতম্য ঘটে ১৯৫০ সালের মাঝামাঝির পর্যাপ্ত এবং অপর্যাপ্ততার উপর ভিত্তি করে। কারণ জাপানের ব্যবসায়ীরা কার্যক্রম সেই সময় থেকে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমান Account Balance কয়েকটি বছর ছাড়া প্রায় বেশির ভাগ সময়ই পর্যাপ্ত থাকে । ১৯৯৮ সালের ১৪.০মিলিয়ন এর রেকর্ড অতিক্রম করার কারণে পরবর্তিতে এর পরিমাণ দাড়ায় ১৫.৮% মিলিয়নে । ১৯৬১ সালের পর ১৯৮০ সালে জাপানী ইয়েনের এর মান বেড়ে যায় এবং পরবর্তিতে পুঁজিবাদ বেড়ে যায়[১২]।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী ব্যবসা এবং বিনিয়োগ

North America, Asia , Europer দেশগুলোর সাথে জাপানের ব্যবসায়ী লেনদেন বৃদ্ধি পায়। WTO এর অন্তর্ভূক্ত হয়ে জাপান বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকে এবং বিনিয়োগ শুরু করে।

বাণিজ্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিরাট একটা নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বিদেশীদের সাথে ব্যবসা কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জাপানের। এ তেমন কোন উন্নতি হয়নি ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে। পরবর্তি সময়ে অতিমাত্রায় পণ্য উৎপাদন এবং প্রযুক্তির প্রভাবে তাদের ব্যবসায় নাটকীয় প্রভাব আসে। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তাদের বেশির ভাগ লেনদেন থাকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে।

রপ্তানি

১৯৫০-১৯৫০ সাল পর্যন্ত পোশাক ও ভারিপণ্য রপ্তানি করে জাপান অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ কাটিয়ে উঠেছিল। ১৯৭০ সালে কেমিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতির রপ্তানির উপর উচ্চ মাত্রার কর আরোপ করা হয়। ১৯৮০ ও ১৯৯০ সালে Computer, Automobile সহ অন্যান্য পন্য বেশি রপ্তানি হতে থাকে। এর পর তাদের পণ্যের মান আরো উন্নত করতে china , Asia তে শ্রমিক পাঠাতে থাকে। প্রথম ১৯৮০ সালে North America ছিল যারা জাপানী পণ্যের প্রধান আমদানী কারক ছিল কিন্তু ১৯৯৯০ সালে South East Asia এগিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

আমদানী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এর ঠিক পরে তেল ও পোষাক শিল্পের কাঁচামাল আমদানী বেড়ে যায় । এই সকল শিল্পের আমদানী বেড়ে যায় ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালের তেল সংকট এবং ১৯৮০ সালের জ্বালানী তেল সংকট অনেকাংশে কমে যায়। এ সকল জিনিসের আমদানীর হার মোট আমদানীর ১৬.০% এ চলে আসে। ১৯৮০ সালে উৎপাদিত পণ্যের আমদানী ছিল অনেক এবং ১৯৯৯ সালে এর পরিমাণ দাড়িয়েছিল ৬২.৪% এবং এর পরে জাপানী ইয়েন এর মূল্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে এশিয়াতে বিভিন্ন শিল্পকারখানা নির্মাণ শুরু করল । স্বাধীন কৃষি পণ্য আমাদানীর জন্য জাপানে খাবার আমদানী ও বেড়ে চলেছিল ।

বিনিয়োগ

১৯৮০ সালে বিদেশি বিনিয়োগের হার অনেক দ্রুতগতিতে মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিনিয়োগের হার ১৯৯৯ সাালে ৯.৮ ট্রিলিয়ন এ উন্নতি হবার আগেই ১৯৯০ সালের হার অনেক বেড়ে গিয়েছিল। এই বিরাট পরিবর্তনের কারণ ছিল বিভিন্ন শিল্প কারখানা ও অর্থব্যবস্থার পদ্ধতিগত পরিবর্তন। এই সময় আর্ন্তজাতিক সংস্থাগুলো জাপানকে ২১ শতকের শ্রেষ্ঠ অর্থনৈকি দেশ হিসাবে পরিণত হবার ভবিষ্যত বাণী দিতে থাকে।

এ সময় অর্থনেতিক উন্নয়নের জন্য সারা জাপানকে প্রাথমিকভাবে মূলত তিনটি গঠনগত ভাগে ভাগ করা হয়।

1.Primary industries (কৃষি, বন সম্পদ ও মৎস সম্পদ)

2.Secondary industries (কয়লা শিল্প, ভোগ্য পণ্য ও নির্মান শিল্প)

3.Tertiary industries (শক্তি ও পানির ব্যবহার, যানবাহান যোগাযোগ পাইকারী ও খুচরা বিক্রি, ব্যাংকিং, Real state, ব্যবসা ও ব্যক্তিগত সেবা এবং জন প্রশাসন)

এ সকল কারনে জাপানে GDP এর হার কমতে থাকে[১৩]।

Dhaka University Institutional Repository

২১ শতকের শুরুর দিকে জাপানের Ministry of Economy Trade and Industry তাদের চূড়ান্ত Report প্রকাশ করে। এ Report অনুযায়ী জাপানের সরকারের আকার ছোট করা প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং তথ্য ও প্রযুক্তি কে কাজে লাগিয়ে শিল্পের গঠনকে পূর্ণাকৃতির প্রয়োজন পড়ে। এক্ষেত্রে Hardware, Software সহ অন্যান্য Space Craft শিল্পের উৎপাদন বেড়ে যায়। এই উন্নতিকে বলা হল Post industrism"|

চাকুরী

প্রতিষ্ঠানক যোগসূত্রে, Seniorty system এ আজীবন চাকুরির মেয়াদে, এই তিন ভাবে চাকুরির দেয়ার নিয়মনীতি তৈরি হয় জাপানে, ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরের সময় থেকে। আজীবন চাকুরির Systeam এ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে পাশ করা কর্মীদের শিক্ষা জীবন শেষ হবার পর পরই চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া হত এবং এটা চলত তাদের অবসর নেয়া পর্যন্ত। আজকাল এই Life time চাকুরি বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও জনপ্রতিষ্ঠান গুলোতে প্রায় অনুপস্থিত।

Seniorty system এ একজন কর্মীর পদমর্যাদা, বেতন ও যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এবং চাকুরির সময়কাল বেধে দিয়ে চাকুরি দেয়া হত। ইতোমধ্যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ফলে শ্রম বাজারের পরিবর্তন আসে। ফলে জাপানিদের জন্য চাকুরি দেয়ার ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত তিনটি ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। বড় বড় কোম্পানির শ্রম চাহিদা আরো বাড়তে থাকে। এক্ষেত্রে কোম্পানিগুলো যোগ্যতার ভিত্তিতে অভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দিতে থাকে যার ফলে যার Life-time চাকুরি মেয়াদে ঢুকেছিল তারা বিপাকে পড়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

অন্যদিকে যারা Young ছিল তারা নতুন চাকুরির সন্ধান করত আরো বেশি টাকা Income করার জন্য। Part-time চাকুরিজীবীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছিল এবং ১৯৯০ সালে ১৫% এবং ১৯৯৮ সালে ২১% এ আসে। নারীরাই Part time workers দের ৭০% নিয়ন্ত্রণ করত। এর ফলে কর্মীরা সবাই দিন দিন চাকুরি বদল করার কারণে অভিজ্ঞ হত। এর প্রভাবে কর্মীদের demand , supply এর ক্ষেত্রে মারত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জাপানে বেকারত্বের হারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৬০ ও ১৯৭০ সালে বেকারত্বের হার ২% এর নিচে ছিল কিন্তু ১৯৯৩ সালে এর হার গিয়ে দাড়িয়েছিল ৫.৫% এ এবং এই বেকারত্বের সমস্যা দিন দিন বেড়ে চলতে থাকে[১৪]।

শক্তি সম্পদ উৎস

জাপানের অতিরিক্ত শক্তির চাহিদার ফলে শক্তি সম্পদের উৎস সীমাবদ্ধ থাকে। প্রাথমিক শক্তি সরবরাহের জন্য জাপানের আমদানীর উপর নির্ভরতা ১৯৬০ সালে ছিল ৪৩.৪% এবং ১৯৯৮ সালে ছিল ৮০%।

যদিও জাপান দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল আমদানীকৃত তেলের উপরে। তথাপি তারা তেল সংরক্ষণের চিন্তা করে কিন্তু এতে করে সমস্ত শক্তি সরবরাহ ১৯৭৫ সালে ৭৩.৪% এ এবং ১৯৯৮ সালে ৫২.৪% এ নেমে আসে। এর মধ্যে Nuclear power বেড়ে দাড়ায় ১.৫% থেকে ১৩.৭% এ এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বেড়ে দাড়ায় ২.৫% থেকে ১২.৩% এ যেখানে কয়লা সম্পদের উন্নয়ন পরে থাকে ১৬.৪% এ এবং Hydroeliectric এর উন্নতরি হার নেমে যায় ৫.৩% থেকে ৩.৯ ভাগে।

১৯৭৩ সালের তেল সংকটের কথা মনে রেখে জাপান বিদ্যুৎ শক্তির উপর সরাসরি চাপ কমিয়ে আনতে চায় এবং এর জন্য পরিবর্তক হিসাবে কয়লা, গ্যাস এবং পারমানবিক

Dhaka University Institutional Repository

শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উপাদনের উপর জোর দিতে থাকে । ১৯৯৯ সালে জাপানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সামগ্রীক পরিমাণ দাড়িয়েছিল ১,০৬৬ কিলোওয়াট ঘন্টা যার মধ্যে তেল, তরল গ্যাস এবং কয়লা দ্বারা উৎপাদন ছিল ৬১%, পারমানিবক শক্তির চুল্লির ৩০% এবং তরল বিদ্যুৎ ও অন্যান্য শক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপান ছিল ৯% ।

এ সময় পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কথা চিন্তা করে পারমানিক শক্তির উপর জোর দেয়া হয় কারণ পারমানবিক শক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন হলে পরিবেশে ($CO_২$) কার্বনডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় না। ২০০০ সালে জাপানের ৫২টি পারমানবিক চুল্লি থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ছিল ৪৫.০৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট। এর মধ্যে বিভিন্ন পারমানবিক চুল্লিতে ছোট বড় কয়েকটি দুর্ঘটনা জাপানের জনমনে ভীতির সৃষ্টি করে পারমানবিক শক্তির উপর।

এখন জাপান সৌরশক্তি ব্যবহার করে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে চায় যদি তারা সফল হয় তবে ২০৩০ সালের মধ্যে তারা তাদের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ অর্জন করতে সক্ষম হবে[১৫] ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই জাপান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লাবিক পরিবর্তন আসে। কিন্তু এর পরেও যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান ইউরোপ দেশগুলো থেকে জাপান কিছুটা পিছিয়ে আছে। জাপানকে উন্নতির সামনের অবস্থানে আনতে ১৯৯৬ সালে Science and Technolgoy Baisve plans নামে একটি আইন বাস্তবায়িত করে এবং এই আইনটি তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের মেরুদন্ড হিসাবে কাজ করে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করার জন্য ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত ব্যয় ধরা হয়েছিল মোট বাজেট থেকে ১৭ ট্রিলিয়ন ইয়েন। ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ২য় বাজেট ধরা হয়েছিল ২৬

Dhaka University Institutional Repository

ট্রিলিয়ন ইয়েন। এজন্য সরকার ব্যাপক ভাবে কাজ করতে যায়। পরবর্তিতে RSD এর উন্নতি সাধিত হয়।

জাপানে বিভিন্ন বিদেশীদের সংস্থার সাথে একযোগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা জোরদার করে। জাপান ৩০ টির বেশি দেশের সাথে দ্বিপাক্ষীক অবস্থান জোরদার করে এবং ৬টি দেশের সাথে পারমানবিক শক্তির উন্নয়ন নিয়ে চুক্তি করে। এরপর জাপান বিভিন্ন দেশের সাথে বিশেষ করে U.S.A এর সাথে অনেক পত্র বিনিময় করে এবং আনবিক শক্তি সহ অন্যান্য প্রযুক্তির উন্নতির চেষ্টা করে[১৬]।

পারমানবিক শক্তির উন্নতি ও ব্যবহার

পারমানুর উন্নতির জন্য আনবিক শক্তি কমিশন ৫ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা করে পরবর্তিতে এটার ব্যাপক উন্নয়ন ও প্রসার ঘটে।

মহাকাশ প্রযুক্তি

মহাশুন্য কর্মকান্ডের মৌলিক নীতির উপর নির্ভর করে জাপানের মহাকাশ প্রযুক্তি উন্নয়ন তরান্বিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য উৎস

১. ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -১৬২

২. ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -১৬৭

৩.জাপানের ইতিহাস, ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -১৬৯

৪.ড.সিদ্ধার্থ গুহ রায় , আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৯৬,

পৃষ্ঠা -২২৬

৫. জাপানের ইতিহাস, ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -১৭২

৬. জাপানের ইতিহাস, ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -২০৬

৭. The japan book.

Kodansha Intertional ,Tokyo.
Page-62

Dhaka University Institutional Repository

৮. The japan book.

Kodansha Intertional ,Tokyo.
Page-54

৯. The japan book.

Kodansha Intertional ,Tokyo.
Page-56
১০.ইন্টারনেট

১১. The japan book.

Kodansha Intertional ,Tokyo.
Page-57
১২.The social and economic history of japan

E.Honjo,Page-272

১৩. ড.সিদ্ধার্থ গুহ রায় , আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৯৬,

পৃষ্ঠা -২৩৫

১৪. মন্মথনাথ ঘোষ,সুপ্ত জাপান, নব্য জাপান

পৃষ্ঠা-২৫

১৫. রাজনারায়ণ বসু,একাল ও সেকাল,

পৃষ্ঠা -২৩

১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জাপানে ও পারস্যে,

পৃষ্ঠা -২১

Dhaka University Institutional Repository

চর্তুথ অধ্যায়

জাপানে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

Dhaka University Institutional Repository

জাপানে ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ

ধর্ম একটি মৌন ও সার্বজনীন মানবীয় প্রতিষ্ঠান ধর্ম আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এক অতীব গুরুত্বপুর্ণ স্থান দখল করে আছে। ধর্মের অস্তিত্ব নেই অথবা ছিল না এমন কোন মানব সমাজের কথা সমাজ বিজ্ঞানী, নৃ-বিজ্ঞানীদের জানা নেই। নৃ বিজ্ঞানী Murdock (মার্ডক) বলেন, সব সমাজেই কোন না কোন পন্থায় অতি প্রকৃত শক্তিকে তোষামোদ করে এবং নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করে। ধর্মকে অবলম্বন করে মানুষ তার ইহজগত ও পরজগতে শান্তি পেতে চায়, মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক এ সদূর প্রসারী।

ধর্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ Religion শব্দটি Religious থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে ধর্ম বা Bond আবার ধর্ম শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে ই ধাতু থেকে। এই অর্থে যা মানুষকে ধারন করে তাই ধর্ম।

নৃ-বিজ্ঞানী E.B Tylor তার primitive culture-১৮৭৪ গ্রন্থে বলেন Belief supernatural beings নৃ-বিজ্ঞানী ফ্রেজার বলেন ধর্ম হল মানুষের থেকে উন্নত বিভিন্ন শক্তি যা প্রকৃতির ধারা মানব জীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করা হয় তাদের প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি সাধন।

অধ্যাপক ব্যাপকই ভার ধর্মের ধারনা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আত্মিক সম্পর্কের কথা বলেছেন, তার মতে ধর্ম কোন মাত্র মানুষের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করে তা নয়, ধর্ম মানুষ অন্য কোন উর্ধ্ব শক্তির মধ্যে সম্পর্কের সৃষ্টি করে। ত্রমিন বলেন, ধর্ম হল

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলো বিশ্বাস ও সুসংবদ্ধ আচরন প্রণালী যা কিছু অপার্থিব অলঙ্ঘনীয় ও উচ্চ স্তরের তাই পবিত্র বস্তু হিসেবে পরগনিত হয়।

উপরোক্ত সংজ্ঞা গুলো বিশ্লেষণ করে আমরা বলতে পারি যে, মানুষের থেকে ও উন্নত এক শক্তিকে বিশ্বাস ও আস্তাই হল ধর্ম।

সমাজ দর্শনের সৃষ্টি কোন থেকে ধর্মের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ব্যক্ত হয়। সমাজ দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম বলতে মানব জীবনের সর্বোচ্চ মূল্য বোধের স্বীকৃতিকে বোঝায়। ফরাসী সমাজ বিজ্ঞানী Augcust cote এর মতের ধর্ম ও মানবতা হল অভিন্ন। তিনি মানবতাকেই ধর্ম হিসেবে গণ্য করার পক্ষেপাতী। ধর্মের সামাজিক তাৎপর্য এ ধারনার মধ্যেই নিহিত[১]।

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব

মানব সমাজের উপর ধর্মের বিশেষ বা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অধ্যাপক চয়েনবী ও কম্পনের অভিমত অনুসারে মানব সভ্যতার কর্মস্থলে ধর্মের উৎপত্তি বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যক্তি জীবনে সমাজ জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই ধর্মের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুত সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা এবং সমগ্র সমাজ জীবনের উপর ধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এক বিশেষ স্থান অধিকার আছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যের তুলনায় প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে আজও ধর্ম সমাজ জীবনকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে রাখছে। ধর্ম হচ্ছে মূলত মানুষের থেকে মহৎ

Dhaka University Institutional Repository

এবং উন্নত এক শক্তিতে বিশ্বাস ও আস্থা। এই বিশ্বাস ও আস্থার ভিত্তিতে কিছু অনুভূতির সঞ্চার হয়। যা মানব সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করে ও প্রভাবিত করে। Fmile Durkhim বলেন Religion is universal it must perform some vital funtion in human society নিম্নে ধর্মের সমাজ তাত্ত্বিক কাজসমূহ উল্লেখ করা হলঃ-

সামাজে ধর্মের দুটি ক্রিয়া বিদ্যমান 1) Functional,

2)Disfunctional,

Functional ধর্মের মাঝে কিছু উপাদান বিদ্যমান সমাজে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। যেমন-

Holy বলতে পরিব্যাপ্ত শক্তির অধিকারী কোন god person god, a whole rehm of and spirt ইত্যাদি বুঝিয়ে থাকে। যদিও প্রকৃত অর্থে Holy বলতে কিছুই নেই তবুও এই অদৃশ্য শক্তি সমাজকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে।

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদি অংশ নেওয়া বা মেনে নেওয়াই হল response, ধর্মের এই Farth comonitment গুলি মানুষের জীবন ও চরিত্রকে যে অনুপাতে তৈরি করে।

প্রত্যেক ধর্মে কিছু Belief বিদ্যমান যাকে। যা মানুষকে অপবিত্রতা থেকে দূরে রেখে পবিত্রতার মাঝে প্রবাহিত করার প্রয়াস চালায়[২]।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম মানুষের অস্তিস্ব সম্পর্কে ধারণা ও তার ব্যাখ্যা প্রদান করে

Religion is a source of personal confort and consolation

ধর্ম মানুষকে এমন একটি মানবিক সমর্থন দেয় যার জন্য খুব দুরুহ অবস্থার মধ্যেও নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারে।

ধর্ম মানব অস্তিত্বকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে। কারণ মানব অস্তিত্ব সন্দেহযুক্ত, অনিশ্চিত ও দৈব নির্ভরর। বাস্তব পরিনতি যেমন- হতাশা, নিরীক্ষা, ব্যার্থতা, দুঃখ, কষ্ট বিষয় এবং চূড়ান্ত পরিনতি মৃত্যু ইত্যাদি গ্রহণ করার সামর্থ্য দেয়। মৃত্যুর পর আরেকটি জীবন আছে এবং সেটাই আসল যে সম্পর্কে মানুষকে পুরোপুরি ধারনা প্রদান করে। এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণেই মানুষ মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে।

ধর্ম নিশ্চয়তা প্রদান করে

ধর্মীয় বিশ্বাস পদ্ধতি, আচার রীতি ব্যক্তিকে তার জীবনের সদা পরিবর্তনশীল অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেমন-পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ বলেছেন বিনা কারণে আমি কিছু সৃষ্টি করিনি। আর আল্লাহ যা করেন মানুষের মঙ্গলের জন্যই করেন যার কেউ নেই আর আল্লাহ আছেন ইত্যাদি বিশ্বাসগুলোর মাধ্যমে ধর্ম শুধু ভয়-ভীতির দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ধর্ম আত্মপরিচয় দান করে

বৃহৎ সমাজে ধর্মীয় ব্যবস্থায় মানুষের নিজেকে বা আমি কে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়। ধর্ম জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। ধর্মীয় বিশ্বাসের

Dhaka University Institutional Repository

ফলে তাদের অহংবোধ বিস্তৃতি লাভ করে এবং বিশ্বব্রমান্ডকে তাদের নিকট অর্থবহ করে তোলে। অর্থাৎ ধর্ম মানুষকে বিধি বন্ধনহীন ও বিভিন্নতা হতে রক্ষা করে।

উন্নয়নে ধর্ম

কাজ করে জীবিকা নির্বাহ এবং আপন চেষ্টায় ধর্ম-সম্পত্তি অর্জন করার সব ধর্মেই স্বীকৃত এবং প্রসংসিত। ধর্ম মানুষের কৃ-প্রবৃত্তিগুলো দমন করে এবং তার মধ্যে পরাপকার প্রস্তুতি ও সহানুভূতির মনোভাব জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া অবসরভোগী খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকরা শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের সাহায্য করেছেন।

সংহতি রক্ষার্থে ধর্ম

প্রাচীন যুগ হতে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনা সামাজিক সংহতি রক্ষার্থে ক্ষমতাশালী শক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে। একদিকে প্রচলিত মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি নীতি, আচরন ধর্মকে সমর্থন লাভ করে জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে। এর অপরদিকে এ সবই ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলে।

ধর্ম সমাজকে বৈধতা দেয়

সমাজকে টিকিয়ে রাখার জন্য যত রকম শক্তি, সামথ্য আদর্শ, মূল্যবোধ প্রয়েজন তা ধর্ম যোগান দেয়। সামাজিক নিয়মকে কমিয়ে রাখার জন্য ধর্মীয়, কার্যাবলী বৈধ ও বৈধ ও ন্যায়বিচার করে এবং নেতিবাচক কাজের কাজের জন্য প্রয়োচিতমূলক ব্যবস্থা করে। যেমন-হিন্দু সমাজ মন্ত্রপড়ে কিছু অনুষ্ঠান করে প্রায়শ্চিত করার নিয়ম আছে।

Dhaka University Institutional Repository

নেতিবাচক দিক

ধর্ম রক্ষনশীলতাকে সমর্থন করে ধর্ম মূলত বরাবরই বদ্ধ ঘৃণা ধারনা ও রক্ষনশীলতার সমর্থক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ধর্মের কারণে স্যানিথিত্ত তার প্রতিষ্ঠিত মতবাদ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানের ধর্ম রইন ও ঘ্যাস্কলীর মতবাদের বিরোধীতা করেন।

ধর্ম বিভেদ সৃষ্টি করে

সত্য সমাজে ধর্ম যেমন সমন্বয় সাধন করে তেমনি বিভেদ সৃষ্টি করে। ধর্ম একদিকে যেমন কোন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি গড়ে তোলে অপরদিকে তেমনি আন্তগোষ্ঠীর সংঘাতের কারণ হয়। যেভাবে এমন সমাজের দৃষ্টান্ত অবশ্যই আছে যেখানে ধর্মের বন্ধন কিছুটা পরিমান সংবদ্ধতার প্রেরণা যুগিয়েছে।

ধর্ম পরিবর্তনকে বাধা দেয়

ধর্মীয় ভাব মানুষের মাঝে নিষক্রিয়তা সৃস্টি করে জনগণকে মুহ্যমান করে রাখতে পারে। ধর্ম মানুষের বিচার বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয় পৃথিবীতে এই যে দুঃখ দুর্দশা শোষণ থাকা সত্ত্বেও ধর্ম পার্থিব জীবনকে মৃত্যহীন করে পরবর্তী জীবনকে গুরুত্ব দেয়। ধর্ম শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের নিরবিছিন্ন সংগ্রাম ধ্বংস করে পরিবর্তনকে বাধা দেয়।

ধর্ম অতিরিক্ত ভাবদর্শনে বাধা দেয় ধর্মের আরেকটি নেতিবাচক দিক হতে তা জ্ঞানের পরিধিকে সীমিত করতে চায় এবং সীমিত জ্ঞানের সাহায্য কোন

Dhaka University Institutional Repository

কিছুকে পবিত্র বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় বা ভবিষত্বের বাধা। যেমন- মানুষ বিশ্বাস করে পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং এটাই ঠিক। মানুষ এ বিশ্বাসের মাঝে অবস্থান করে। ধর্মকে ঘিরে যে সব কিছু ধাবমান এটা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা সত্য কিন্তু ধর্ম বরাবরই তার বিরোধীতা করে আসছে। কাজেই ধর্ম ও বিজ্ঞান মাঝে বিদ্যামান তা জটিল।

ধর্ম সমাজের প্রকৃত রূপকে আড়াল করে রাখে। Marx ধর্মকে বিপ্লবের পরিপন্থী বল মনে করেন। তার মতে ধর্মের নাগপাশ হতে সর্বহারাদের মুক্ত করতে না পারলে প্রকৃত সর্বহারাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই তিনি ধর্মকে বাদ দিয়ে একটি সমাজের সমাজের কথা বলেন যেখানে ধর্ম হবে দুর্বৃত্বহীন[৩]।

জাপানে ধর্ম

প্রাচীন যুগ থেকে আরম্ভ করে প্রাক্-আধুনিক কাল পর্যন্ত জাপানে তিনটি ধর্মের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়- শিন্তো, বৌদ্ধ ও কনফুসিয়াস। এ ছাড়া খ্রিস্টান, ইয়ুহিদী ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম পালনে ও ভিন্নতা দেখা যায়। উচু পাহাড়ের চুড়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয় দেখা যায়। কিয়োটোতে ধর্মীয় উপাসনালয় বেশী চোখে পড়ে। কিয়োমিজু মন্দিরের কথা ধরা যাক, পাহাড়ের চুড়ায় এর অবস্থান। অনেক উপর থেকে পানি পড়ছে। জাপানীদের ধারনা এই পানি পবিত্র। পবিত্র পানি পান করলে তার পূন্য অর্জন করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম পালনের উপর জরিপ করে দেখা যায়-

শিন্তোধর্ম-১০৭ মিলিয়ন

বৌদ্ধধর্ম-৯১ মিলিয়ন

খ্রিস্টানধর্ম-৩ মিলিয়ন

অন্যান্য ধর্ম-১০ মিলিয়ন

ইয়ুহিদধর্ম-৬০০জন আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান জাপানে অবস্থানরত,

শিন্তো ধর্ম

শিন্তো ধর্মের আদর্শ অনুসারেই প্রথম সম্রাট জিম্মুকে জিম্মু তেন্নো বলা হত। শিন্তো ধর্ম বহুদেবতাবাদকে স্বীকৃতি দেয়। এই ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী জাপানের অধিবাসীরা সূর্যদেবী, বৃষ্টির দেবতা, ভূমিকম্পের দেবতা ও নানা অলৌকিক শক্তির পূজা করতেন।এই ধরণের অলৌকিক শক্তির পূজা জাপানে কামির উপাসনা নামে পরিচিত ছিল।

শিন্তো ধর্মের আদর্শ বা বিশ্বাস গুলো নিম্মে আলোচনা করা হল:

১.জাপানের সম্রাট-বংশ সূর্য দেবী থেকে উৎপন্ন হয়। স্বর্গ ও মর্ত্য সৃষ্টি হওয়ার পর ইজানাগী নামে এক দেবতা আবির্ভুত হয়। ইজানাগীর হাতে একটা দন্ড সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়। এক সময় দন্ডটি উত্তলন করলে তার পানি চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে জলবিন্দু পড়ে সেই সব স্থানে এক একটি দ্বীপের সৃষ্টি হয়। ঝড় ধ্বংসের প্রতীক এবং সূর্য

Dhaka University Institutional Repository

কিরণ প্রাণদায়ক। ঝড়ের প্রকোপ থেকে উদ্ধারের জন্য সূর্যস্তুতি প্রয়োজন। অন্যথায় দেশের অজ্ঞানতার তমসা-বিস্তার এবং শস্যহানি অনিবার্য। তাই প্রাচীন জাপানে ধর্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল সূর্যদেবীর আরাধানা।

২.শিন্তো ধর্ম পরিপূর্ণভাবে তাত্ত্বিক উন্নয়ন ঘটাতে পারিনি যা অন্যান্য ধর্ম পেরেছে। এর নিজস্ব কোন ভিত্তি নেই।

৩.শিন্তো ধর্ম মৃর্ত্যুর পর উচ্চ মাপের স্বর্গ এবং নরক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিতে অক্ষম। কিন্তু জীবন পরবর্তী কিছু খুটিনাটি বিষয়ে ধারণা দেয়।

৪.এই ধর্মে পুর্ণজন্মে বিশ্বাসী।পূর্ব পুরুষগণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করছে। সবাই পবিত্র মনের অধিকারি এবং সষ্ট্রার কাছে সহজে পৌঁছানো সম্ভব।

৫.সকল মানব জাতি কামীর সন্তান বলে স্বীকৃত। সকল মানব জাতি এবং তাদের প্রকৃতি পবিত্র।

৬.অমরত্ব লাভ শিন্তো ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক কর্ম,ধ্যান এবং আচরণ দ্বারা সম্ভাব।

৭.শিন্তো ধর্মের কয়েকটি চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে। ঐতিহ্য ও পরিবারের মধ্যে পরিবারই প্রধান অস্ত্র যা ঐতিহ্য ধরে রাখে। শিন্তো ধর্মের প্রধান অনুষ্ঠান হলো বিবাহ বার্ষিকী ও জন্ম বার্ষিকী। প্রকৃতি হলো পবিত্র আর প্রাকৃতিক কর্মই তাদের আত্মাকে পবিত্র করে। শারিরীক পবিত্রকে প্রাধান্য দেয়। শিন্তো ধর্মের অনুসারিরা গোসল, হাতধোয়া ও মুখ পরিস্কার নিয়মিত করে থাকে।

৮.তাদের প্রত্যাশা শান্তি যা সমগ্র বিশ্বকে যুদ্ধ থেকে উত্তরণ করবে এবং পুর্নগঠন করবে[৪]।

Dhaka University Institutional Repository

শিন্তো ধর্ম যেহেতু সম্রাটের দৈবশক্তির কথা প্রচার করে, সেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই এই ধর্ম জাপানের উগ্র দেশপ্রেমের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। জাপানের শাসক শ্রেণী সুকৌশলে এই ধর্মকে ব্যবহার করে জনসাধারণকে সম্রাট ও তাঁর পরিবারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বাধ্য করে, রাজার প্রতি আনুগত্য এবং উগ্র দেশপ্রেমকে একাকার করে ফেলার এক সুচতুর প্রয়াস জাপানের শাসক শ্রেণীর তরফ থেকে পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মঃ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক গৌতম বুদ্ধ। তিনি নেপালের তরাই এলাকার কপিলাবস্তর লুম্বিনী গ্রামে ৫৬৫ খ্রীঃ জম্ম গ্রহন করেন। গৌতমের পিতা ছিলেন শাক্য জাতির গোষ্ঠী নেতা শুদ্ধোধন এবং মাতা মায়া দেবী।গৌতমের পিতা ছিলেন ক্ষত্রিয়। বাল্যকালে গৌতম মাতৃহারা হন এবং মাসী প্রজাপতির দ্বারা লালিত পালিত হন। গৌতমকে অস্ত্র ও শাস্ত্র উভয় শিক্ষা শুদ্ধোধন দেন। তার ষোল বছর হলে তিনি গৌতমকে গোপা নামে এক সুন্দরী কন্যার সাথে বিবাহ দেন। তারপর ২৯ বছর বয়সে রাহুল নামে এক পুত্র সন্তান লাভ করে। এক সময় ভাবতে থাকেন সংসারের মায়ার কারণে পরমার্থ ও প্রকৃত মুক্তির পথ হারিয়ে ফেলবেন। এজন্য গৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত নেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই সন্ন্যাস ব্রতকে মহাবিনিস্ক্রমণ বলা হয়[৫]।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সিদ্ধিলাভের জন্য উরুবিল্ব নামক স্থানে একটি অশ্বত্থ নীচে সাধনায় বসেন। অবশেষে দিব্যজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। এর পর ৪৫ বছর বিভিন্ন স্থানে তার ধর্ম প্রচার করেন। মগধ, বিদেহ ও কোশল রাজ্যে প্রভাব বেশী ছিল। ৮০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

কর্মফল এবং তার পরিণাম মানুষের দুঃখ সর্ম্পকে বুদ্ধ চারটি সত্য বা আর্যসত্য উপলব্ধি করেন।

১.মানুষের জীবনে দুঃখ আছে,

২. মানুষের জীবনে দুঃখের কারণ আছে,

৩. মানুষের জীবনে দুঃখ নিরোধের উপায় আছে,

৪. মানুষের জীবনে দুঃখ নিরোধের জন্যে সঠিক মার্গ বা পথ অনুসরণ করতে হবে। এই চার সত্যকে বুদ্ধ আর্য সত্য বলেন[৬]।

মানুষের জীবনে দুঃখ নিরোধের জন্যে অষ্টাঙ্গিকা মার্গ অনুসরণ করলে মুক্তি পাওয়া সম্ভাব। অষ্টাঙ্গিকা মার্গ হল-

১.সৎ বাক্য,

২.সৎ কার্য,

৩.সৎ জীবন,

৪.সৎ চেষ্টা,

৫.সৎ চিন্তা,

Dhaka University Institutional Repository

৬.সৎ চেতনা,

৭.সৎ প্রতিজ্ঞা,

৮.সৎ দর্শন বা সম্যক সমাধি,

বুদ্ধ বলেন যে,প্রথম তিনটি পালন করলে সৎ শীল বা শুদ্ধশীল হওয়া যাবে। শীল বলতে নৈতিক শুদ্ধতা বুঝায়। দ্বিতীয় তিনটি মার্গ পালন করলে সমাধি বা চিত্তের প্রশান্তি আসবে,কামনা বাসনা দূর হবে। শেষ দুইটি পালন করলে উদিত হবে প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান। প্রজ্ঞা বা পরম জ্ঞান উদিত হলে আপনা থেকেই আসবে আসক্তিহীনতা,অহিংসা। তাহলে মুক্তি লাভ সহজতর হবে[৭]।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। রক্ষণশীল শিন্তো ধর্মালম্বীদের তীব্র বিরোধীতা সত্ত্বেও বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপারে কিছু দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। চীন এবং কোরিয়ার সক্রিয় প্রচেষ্টায় জাপানে গৌতম বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হয়েছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জাপান সম্রাট শোটোকু স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তখন থেকেই শিন্তো ধর্মের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু ঊনবিংশ শতকে মেইজি পুনরুভ্যুদয়ের পর শিন্তো ধর্ম তার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করে। তখন থেকেই সম্রাটের প্রতি আনুগত্য এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে শিন্তো ধর্ম[৮]।

Dhaka University Institutional Repository

কনফিউসীয় ধর্মঃ

প্রাচীন চীনের গৌরব কনফিউসিয়াস (খ্রীঃ পূ ৫৫১-৪৭৯) ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রচারক ও বাস্তবধর্মী রাজনীতিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে ধর্মপ্রচারক আখ্যা না দিয়ে নীতি প্রচারকরূপে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনি চীন জাতিকে তথা বিশ্ববাসীকে উপহার দেন অতীব উচ্চমানের কতকগুলি নৈতিক নিয়মাবলী। তিনি মানুষ্য চরিত্রে প্রধানত পাঁচটি নৈতিক গুণের অনুশীলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যথাঃ দানশীলতা, পবিত্রতা, জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা এবং বিশ্বস্ততা, যেমন ভারতের মৌর্য সম্রাট অশোক মৌর্য তাঁর প্রচারিত ধর্মে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। চীনের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রানুসারে রাজার সঙ্গে প্রজার, পিতার সঙ্গে পুত্রের, স্বামীর সঙ্গে সহধর্মীনীর, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে কনিষ্ঠের এবং বন্ধুবান্ধবগণের মর্ধ্যে পরস্পর কিরূপ সম্পর্ক থাকা উচিত সে শত কনফিউয়াস অতি বিশদভাবে ব্যবস্থা করে তাঁর পান্ডিত্যের তথা মানবিকতাবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। সম্রাট অশোকের ধর্মেও অনুরূপ কতকগুলি আচরণবিধির নির্দেশ পাওয়া যায়, প্রাণীদের প্রতি অহিংসা, পিতামাতার সেবা, গুরুজনের সেবা, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়গুলো। এছাড়া এ ধর্মে অন্যতম একটি বিষয় ছিলো আত্মীয়স্বজন তথা ব্রাহ্মন এবং যেমন সন্যাসিদের প্রতি উদারতা এবং সুসঙ্গত আচরণ প্রদর্শন। কনফিউসীয় ধর্ম বৌদ্ধধর্মের মত চীন এবং কোরিয়ার মাধ্যমে জাপানে প্রচারিত হয়[৯]।

Dhaka University Institutional Repository

শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কনফিউসীয় ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও জাপানিরা মূলত ধর্মভাবের উপর দেশপ্রেমেকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। জনৈক বিদেশী পর্যটক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি জাপানিদের অনুরাগ দেখে এক সুপ্রসিদ্ধ জাপানি পুরোহিতকে একদা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহাশয়, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হয়ে জাপান আক্রমন করেন, তা হলে আপনারা কি করবেন ? প্রত্যুত্তরে পুরোহিত মহাশয় নাকি বলেছিলেন "তাহলে বুদ্ধদেবের শিরচ্ছেদ করে মুন্ড নিয়ে জন্মভূমির পুজা করব"।

রুশ জাপান যুদ্ধ কালে (১১০৪-০৫) কোন এক জাপানি বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তানকে যুদ্ধে যোগদান করতে আহ্বান করা হলে সে তার বৃদ্ধা মাতার নিকট গিয়ে কাতরস্বরে নিবেদন করে যে বৃদ্ধা বয়সে তাকে নিঃসহায় অবস্থায় রেখে যুদ্ধে যোগদান করতে তার মন সায় দিচ্ছে না।

সেই সঙ্গে যুবকটি জানতে চায় এক্ষেত্রে তার করণীয় কি। বৃদ্ধা মাতা কোন উত্তর না দিয়ে পক্ষান্তরে প্রকাশ করেন এবং পুত্রের নামে একটি চিঠি লিখে তৎক্ষনাৎ আত্মহত্যা করেন। ইত্যবসরে যুবক পুত্রটি তার বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে যা দেখতে পান তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে যায়। বৃদ্ধার শেষ চিঠিতে যা লেখা ছিল তার মর্মকথা এইরূপ! ব্যস, তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার মন অতি ক্ষুদ্র দেখে আমি মর্মহত হয়ে আত্মহত্যা করলাম। তুমি জগতে এক নগন্য বৃদ্ধার জন্য তোমার ও

Dhaka University Institutional Repository

তোমার পূর্ব পুরষদের এবং তোমার দেশস্থ সকলের অর্চনীয়া জন্মভূমিকে তুচ্ছজ্ঞান করছ। ধিক! তোমাদের বংশে, আর ধিক তোমার গর্ভধারিনীকে[১০]।

খ্রীস্টান ধর্ম

খ্রীস্টান ধর্মের প্রচারক যীশু খ্রীষ্ট। যীশু জন্ম সম্পর্কে বাইবেলে বর্ণনা আছে যে, সমগ্র মানব জাতির জন্য সাধারণ যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, মার্তৃগর্ভে যীশুর উৎপত্তির ক্ষেত্রে সেই নিয়ম প্রযোজ্য হয়নি। ঘটনাটি ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের বাইরে ঘটেছে। যীশুর ব্যাপারটি একটি একক ঘটনা। মেরী কুমারী মাতা ছিলেন।তার সতীত্ব অক্ষুন্ন ছিল এবং যীশু ছাড়া তার আর কোন সন্তান হয়নি। যীশু তাই জীব বিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম[১১]।

মূলতত্ত্ব

খ্রীস্টান ধর্মের মূলতত্ত্বকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।যথা:

১. এক মাত্র সৃষ্টি কর্তা পরমেশ্বরে বিশ্বাস।

২. যীশুখ্রীস্টের জন্ম, মৃত্যু ও পূনরুত্থানে বিশ্বাস এবং

৩. পবিত্র আত্মার প্রেরণা ও পরকালে বিশ্বাস।

খ্রীস্টান ধর্মের প্রবর্তক

খ্রীস্টান ধর্মের প্রচারক যীশু খ্রীষ্ট। খ্রীস্ট শব্দের অর্থ ত্রাণকর্তা। এছাড়াও পরবর্তীতেযীশুখীস্ট বারোজন শিষ্যকে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য নিয়োগ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা হলেন-

১. শিমন যিনি পিটার নামে পরিচিত,

২. এন্ড্রু

৩. জ্যাকোব,

৪. তদীয় ভ্রাতা জন,

৫. ফিলিপ,

৬. বার্মালোমিউ,

৭. টমাস,

৮. মথি,

৯. আলফেয়ের পুত্র জ্যাকোব,

১০. থিওডোর,

১১. কানোনি শিমন,

১২. জুডাস ইসকারিয়ি।

ত্রিত্ববাদ

খীস্ট ধর্মের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ত্রিত্ববাদ। ত্রিত্ববাদ অর্থ বলতে ঈশ্বরের তিনটি রূপকে বুঝায়।যথা:

১. পিতারূপে ঈশ্বর,

২. পুত্ররূপে ঈশ্বর,

Dhaka University Institutional Repository

৩. পবিত্র আত্মারূপে ঈশ্বর।

১৫৪২ সালে কিশ্যুর পশ্চিম জাপানে ইউরোপ থেকে লোক আসতো। তাদের দুইটি উদ্দেশ্য ছিল- বারুদ আমদানী ও খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করা। ইংল্যান্ড অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে নিম্ম পদের লোকজন অস্ত্র ব্যবসার জন্য পশ্চিম জাপানে আসে এবং মিশনারী প্রতিষ্ঠান গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। ১৫৫০ সালে খ্রীষ্টান মিশনারীরা অনেক সফল ভাবে ধর্মনান্তরিত করে। Francis Xavier রাজধানী কিয়োটোতে অবস্থিত খ্রীষ্টান মিশনারীর দায়িত্ব পালন করে। কিয়োটোতে তোইয়োমি হিদেইয়োশি প্রথম খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহন করে। তারপর নাগাসাকিতে ধর্ম প্রচার করে ২৬ জনে দল গঠন করে। টোকুগাওয়াতে ধর্ম প্রচার করে।

বর্তমানে জাপানে মোট জনসংখ্যার এক থেকে দুই মিলিয়ন খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী। তাদের মধ্যে অনেকেই পশ্চিম জাপানে বসবাস করে। ১৬ শতকে পশ্চিম জাপানে খ্রীষ্টান মিশনারীর কার্যক্রম চালু ছিল সেই হিসাবে পশ্চিম জাপানে খ্রীষ্টান ধর্মের অনুসারী বৃদ্ধি পায়। জাপানে সাধরণ মানুষের মধ্যে কিছু খ্রীষ্টান প্রথা চালু আছে যা খুব জনপ্রিয়।বিবাহ বার্ষিকী, ভালবাসা দিবস ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খ্রীষ্টান প্রথার সাদা পোষাক পরিধান করে[১২]। ১৬৩৮ সালে জাপানে সরকারী ভাবে এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্ঠা চালায় কিন্তু বিদেশী ধর্ম হিসাবে স্থান পায়নি। তবে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর জাপানে খ্রীস্টান ধর্ম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ধর্ম

জাপান হচ্ছে অপূর্ব এক ধর্মীয় বৈচিত্র্যের দেশ সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ইসলাম ধর্মও কম উজ্জ্বল নয়। জাপানের মতো ধর্মীয় অবস্থান ও শান্তি আর কোন দেশে কি পরিলক্ষিত হয় ? আজকের দিনে অধিকাংশ মুসলিম দেশেই শান্তি নেই নানা কারণে। বর্তমানে ৬ লাখ জাপানি মুসলমান আছেন সরকারি হিসাব অনুযায়ী। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাপানিদের মতো জাপানি মুসলমানেরাও শান্তিপ্রিয়। তাদের নিজেদের মধ্যে যেমন কোনো ভেদাভেদ নেই, তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও নেই।

বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, ইহুদি ধর্মের পর জাপানে ইসলাম ধর্ম আসে সবশেষে মেইজি যুগে (১৮৬৮-১৯১২), যখন মহাসংস্কার বা মহাজাগরনের মধ্য দিয়ে আধুনিক হতে শুরু করে।

এখন মুসলিম উসমানীয় সাম্রাজ্য ছিল দক্ষিন-পূর্ব ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য-পশ্চিম এশিয়া, গ্রিস-উত্তর আফ্রিকা জুড়ে একটি সুবিশাল স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু বরাবরই স্বেতাঙ্গ রুশা সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। শেতাঙ্গ শক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে উসমানীয় সম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে নৌপ্রধান ওসমান পাশার নেতৃত্বে ৬শ সেনার একটি দলকে জাপান শুভেচ্ছা সফরে পাঠান।

Dhaka University Institutional Repository

তারা সম্রাট মেইজি, রাজকীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাত এবং ফ্রন্সের নেতৃত্বে রাজকীয় সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু ফেরার পথে ১৬ সেপ্টেম্বর ওয়াকায়ামা প্রিফেকচারের (জেলা) ওশিম দ্বীপের কাছে সামুদ্রিক ঝড়ে রণতরী ডুবে গেলে পরে সুলতানের এক ভাই সহ পাঁচ শতাধিক সেনা মৃত্যুবরন করেন।

তাদের রক্ষা কল্পে জাপানি নৌবাহিনী আপ্রাণ চেষ্টা করে মাত্র ৬৯ জনকে বাঁচাতে সক্ষম হয়। মৃতদের জাপানে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সমাধিস্থ এবং জীবিতদের সম্রাটের নির্দেশে জাপানি রণতরী দিয়ে স্বদেশ পর্যন্ত পৌছে দেওয়া হয়।

এ ঘটনার মধ্য দিয়েই প্রথম কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক প্রচলিত হয় বলে কথিত আছে।

১৯০০ সালের দিকে একজন খ্রীষ্টান জাপানি ব্যবসায়ী মি. আরিগা ভারতের বোম্বে গিয়ে ইসলামী স্থাপত্যকলার প্রেমে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে আহমদ আরিগা নাম নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন।

রুশ -জাপান যুদ্ধের (১৯০৪-০৫) পর জাপান আগ্রহ প্রকাশ করে মুসলিম বিশ্বের প্রতি। মিশর থেকে কিছু সেনা কর্মকর্তা জাপানে এসে রাজকীয় সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করেন এবং তাদের কেউ কেউ জাপানি নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যুদ্ধের পরপর বন্দি রাশিয়ান মুসলিম সেনাদের দ্বারা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় নগর ওসাকায় প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় বলে জানা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৯ সালে ভারতীয় মুসলিম পন্ডিত এবং তুখোড় বিপ্লবী মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ্ টোকিও ইম্পেরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ভাষার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি জাপান ও এশিয়ার মধ্যে প্যান ইসলামিক আন্দোলন সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য আজও স্মরণীয়।

বরকতউল্লাহ্ ১৯২৭ সালে আমেরিকায় মৃত্যুবরণ করেন। এরপর ওই শূণ্য পদে স্থলাভিষিক্ত হন ভারত থেকে আমন্ত্রিত নূর আল-হাসান পার্লাস নামে একজন উর্দুভাষী সু পরিচিত। তিনি এদেশে ১৯৩২-৪২ সাল পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন।

এ বছরের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, আবদুর রশিদ ইব্রাহিমের সঙ্গে জাপানি মুসলিম ওমর ইয়ামাওকা মুসলিম তীর্থস্থান এবং ইস্তাম্বুল ভ্রমণ করেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম জাপানি নাগরিক যিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের পবিত্র তীর্থস্থান পরিদর্শনে যান।

১৯২০-১৯৩০ সালের মধ্যে জাপান মুসলিম চিন্তা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতির প্রতি আরও দৃষ্টি সম্প্রসারণ করে। পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা জাপানি অনুবাদসহ বিভিন্ন ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। কমিউনিষ্ট রাশিয়া থেকে মুসলিমরা জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করে কোবে, নাগোয়া, টোকিও প্রভৃতি জায়গায় স্থায়ী হন। তাদের নেতা আবদুল হাই কুরবান আলীর প্রচেষ্টায় টোকিওতে প্রথম মসজিদ নির্মিত হয় ১৯৩৮ সালে। তাদের দেখাদেখি ভারতীয় মুসলমানরাও ১৯৩৫ সালে কোবে শহরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কুরবান আলী ছিলেন অত্যন্ত কর্মঠ এবং জাপান প্রিয় ব্যক্তি। যিনি জাপানে আরবি ভাষার মুদ্রণ যন্ত্র

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত স্থাপন করে ছিলেন। সেখান থেকে এই ভাষার পবিত্র কোরআন সহ বিভিন্ন ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ ও সাময়িকী প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উসমানীয় সাম্রাজ্য যখন ক্রমাগত বিদেশী আক্রমন শ্বেতাঙ্গ শক্তির চাপ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দযুদ্ধের কারনে অর্থনৈতিক এবং পরবর্তীকালে তরুণ তুর্কি তথা ইয়াং টার্ক রেভূল্যুশনারিদের উত্থানে রাজনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, তখন সুচনা হয় তুর্কী জাতীয় আন্দোলনের মোস্তাফা কামাল পাশা এবং কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে। এ সময় কিছু তুর্কী নেতা জাপানে আসেন সহযোগিতা লাভের জন্য। তাদের আশ্রয় এবং সহযোগিতা দেয় তৎকালীন প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অধ্যাত্মিক চিন্তাবিদ এবং গুপ্ত রাজনৈতিক সংস্থা 'গেনয়শা', কোকুরিইকাই'র প্রধান পরিচালক গুরু তোয়ামা মিৎসুরু এবং তার প্যান এশিয়ানিষ্ট সহযোগিরা।

এই প্যান এশিয়া নিষ্টদের মধ্যে অন্যমত প্রভাবশীল জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবি, ভারতীয় দেব, দর্শন ও ইসলাম ধর্মে সু-পন্ডিত ওকাওয়া শুমেই (১৮৮৬-১৯৫৭) বার্ধক্যে এসে একটি অসামান্য কাজ করেছেন। তিনি মূল আরবি ভাষা থেকে জাপানি ভাষায় পবিত্র আল কোরআন অনুবাদ করেন হাসপাতালে অসুস্থ অবস্থায় ১৯৫০ সালে। এটা ছিল তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এবং এটাই জাপানী ভাষায় প্রথম অনুবাদ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬ সালের দিকে আরেকজন ভারতীয় মুসলিম পন্ডিত ও ধর্ম প্রচারক আলীমুল্লাহ্ সিদ্দিক জাপানে আসেন এবং একাধিক বক্তৃতা দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান যখন এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র দখল করে নেয়, সেসময় দেশে অনেক জাপানি নাগরিক বিভিন্ন কর্ম উপলক্ষে গমন এবং মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে বিখ্যাত জাপানি ব্যক্তিরাও ছিলেন। যুদ্ধের পর জাপানের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সম্পর্ক আরো শক্তিশালী হতে থাকে।

১৯৫৬-১৯৬০ সালের মধ্যে পাকিস্তান থেকে একাধিক দল ও দলনেতা জাপানে আসেন। আধ্যাত্মিক চিন্তা সংস্কারকারী এই আন্দোলনে বহু জাপানি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন মূলত শান্তির লক্ষ্যে।

সত্তর দশকের দিকে জাপানের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে সৌদি আরব, ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি তেল উৎপাদনকারী মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং আজও তা কার্যকর। এশিয়ার দু'টি মুসলিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার প্রকৃত উন্নতির পেছনে জাপানের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালে সৌদি আরব বাদশাহ ফয়সাল বিন আবদুল আজিজ জাপানে সফর করেন। এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আশি-নব্বই দশকে জাপানের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এশিয়া, আফ্রিকার প্রচুর মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষক শিক্ষা গ্রহণে আসতে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

অনুরূপ পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া থেকে অসংখ্য শ্রমিক এসে এদেশের কলকারখানা ও সার্ভিস ক্ষেত্রে কাজ করেছেন, গড়ে তুলেছেন মসজিদ, ছড়িয়ে দিচ্ছেন মুসলিম সংস্কৃতি, রেখে চলেছেন জাপানিদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে জোরালো ভূমিকা[১৩]।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য উৎস

১.সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি

ডঃ হাবিবুর রহমান।

২. E.B Tylor .Primitive culture-১৮৭৪

৩.ইন্টারনেট থেকে,

৪. ড.হরপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়,জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা -২০৬

৫.Yomi no kuni,

Encyclo Vol.3

Page-364

৬.অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা নং ৭৯

৭. মন্মথনাথ ঘোষ,সুপ্ত জাপান,

পৃষ্ঠা নং ৬৮

৮. ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়, আধুনিক দূরপ্রাচ্য: চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৯৬,

পৃষ্ঠা নং ২৩৮

৯. ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়, আধুনিক দূরপ্রাচ্য: চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৯৬,

পৃষ্ঠা নং ২০৫

Dhaka University Institutional Repository

১০. মন্মথনাথ ঘোষ 'সুপ্ত জাপান'

পৃষ্ঠা-৬

১১.বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান

ডাঃ মরিস বুকাইলি

পৃষ্ঠা-১০৪

১২.ইন্টারনেট থেকে,

১৩.দৈনিক সমকাল,

তাং১৯/০৩/২০১১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জাপানের অবস্থান, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রভাব।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতি, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সংস্কৃতির দিকে তাকালেও একই চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। দুর্বল রাষ্ট্রগুলো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে বিকাশিত করতে পারছে না। রাষ্ট্রীয় কোন ব্যাপারেই দুর্বল রাষ্টগুলো নিজেরা নিজেদের কল্যাণে নীতি নির্ধারণ করার সুযোগ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগিদের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুযায়ী প্রকাশ্য ও গোপনে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। গণতন্ত্র,সমাজতন্ত্র, ও আর্ন্তজাতিক মতবাদ অর্থহীন করে ধর্মকে ও ধর্মীয় শক্তিকে জাগিয়ে তুলছে। শিল্পোন্নত এবং আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ সব রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আছে। রাশিয়া ও চীন স্বাতন্ত্র্য নীতি নিয়ে চলছে। আসলে তারা সুস্পষ্ট জাতীয়তাবাদী নীতি নিয়ে চলছে, কোন আর্ন্তজাতিক দায়িত্বই পালন করছে না। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অপমানের সময় থেকে জাপান বাধা পড়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দাড়াতে পারছে না।

একা একলা নিসঃঙ্গ মানুষ দুর্বল, অসহায়, অপূর্ণ। নিসঃঙ্গ , দুর্বল, অসহায়,ও অপূর্ণ অন্যায়। সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও সংগঠিত হওয়া মানুষের ধর্মীয় কতর্ব্য। মানুষ এক প্রজন্মে যা পারে না, প্রজন্মের পর প্রজন্মের চেষ্টায় তা পারে। সাফল্যর মর্মে থাকে সংকল্প ও সংঘশক্তি ,সাধনা ও সংগ্রাম। সাধনা ও সংগ্রাম চালিয়ে গেলে পরাজয় নেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বড় রকমের বিকাশ যখনই ঘটেছে তখনই রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার আইন - কানুন , রীতি-নীতি ও প্রথা পদ্ধতির মৌলিক পূর্নগঠনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। মানুষের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে দুঃখ বঞ্চনা, ভয়, ঘৃণা,অশান্তি সৃষ্টির শক্তি যেমন আছে,তেমনি আছে সম্প্রীতিময়, সুখকর, আশাপ্রদ, সমৃদ্ধ, সুন্দর অবস্থা সৃষ্টির শক্তি[১]।

আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পরই বিশ্বে জাপানের অর্থনীতি দ্বিতীয়, মতভেদে তৃতীয়। বিশ্বের এই অর্থনীতিক পরাশক্তির বর্তমান দুরবস্থা দেখে বিস্মিত হতে হয়। সাম্প্রতিক ভূমিকম্প এবং তার ফলে সৃষ্টি সুনামিতে দেশটি এখন লণ্ডভণ্ড, জনগণ দিশেহারা। সরকার এবং জনগণ যেভাবে ধৈর্য ও সাহসিকতার সঙ্গে সংকট মোকাবিলা করছে, তার থেকে সবারই শিক্ষণীয় অনেক কিছুই রয়েছে। পারমাণবিক চুল্লীতে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ আয়ত্ত্বে আনার জন্য নিবেদিতপ্রাণ বৈজ্ঞানিক এবং টেকনিশিয়ানরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে দেশ ও জনগণকে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তার হাত থেকে বাচাতে প্রাণপণ কাজ করে যাচ্ছেন।

আনবিক বোমা, আনবিক শক্তি, জাপান, দূর্ভাগ্য-এই বিষয়গুলো কি একটি আর একটি সঙ্গে সম্পৃক্ত ? আনবিক শক্তির কুফলের ভাগিদার বরাবরই জাপানীদের হতে হচ্ছে কেন? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা ধরা যাক, ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ প্রায় শেষ। ইউরোপে জার্মানী ও ইতালী আত্মসর্মপণ করেছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে মিত্র শক্তি তখন প্রায় সর্বত্রই জয় লাভ করেছে। নৌ বিমান বাহিনী হারিয়ে জাপানও কার্যত আত্মসর্মপণের দারপ্রান্তে। বিধস্ত অবস্থায় জাপানের ওপর চরম ব্যবস্থা গ্রহণের কোন প্রয়োজন মিত্র বাহিনীর ছিল না। কিন্তু ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অন্য হিসাব কষতে শুরু করে। আটলান্টিক এবং ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের পর আমেরিকার দৃষ্টি তখন প্রশান্তমহাসাগরে;যেখানে তার প্রতিপক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

জাপান। তাকে চিরদিনের জন্য পঙ্গু করতে হবে। জার্মান বৈজ্ঞানিকদের সহায়তায় যুক্তরাষ্ট্র আনবিক শক্তির একমাত্র মালিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বোমাগুলো বানানো হলে সেগুলো কার্যকর কিনা জানা দরকার। নিজ ধর্মাবলম্বী খ্রিষ্টান অথবা একই বর্ণের লোকদের ওপর তো বোমার পরীক্ষা চালানো যায় না। এ কারণেই ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ খ্রিষ্টান প্রতিপক্ষের ওপর এটম বোমা পরীক্ষা করার চিন্তাও করেনি আমেরিকা। ছয় লাখ ইহুদি হত্যাযজ্ঞ ও পোলান্ডসহ ইউরোপের সর্বত্র ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য দায়ী জামানীতে এটম বোমা নিক্ষেপ করা হয়নি। জাপান তো এশিয়ার দেশ; শ্বেতাঙ্গের নয়, নয় খ্রিষ্টান ধর্মের। কাজেই পীতবর্ণের মানুষের ওপর এটম বোমার পরীক্ষা চালাতে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের বিবেক বাধেনি।

৬ এবং ৯ আগষ্ট ১৯৪৫ সালে। যুদ্ধের প্রয়োজন নয়; সন্ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে নতজানু করার প্রয়াসে জাপানের দুইটি বড় শহরে আমেরিকা দুটি এটম বোমা নিক্ষেপ করে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বোমায় তাৎক্ষণিকভাবে দুই লক্ষ লোক মারা যায়। বোমা নিক্ষেপ করে জাপানকে নতজানু করতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি। জাপান জয় করে আমেরিকার সেনাকর্মকর্তারা জনগণের উপর সংবিধান চাপিয়ে দেয়। জাপানের সেনাবাহিনী গঠনে প্রচুর বাধা নিষেধ দেওয়া হয়। জাপান নিজেই পারমানবিক বোমা না বানানোর ঘোষণা দেয়; শুধু বিদুৎ উৎপাদন এবং শান্তিপূর্ণ ব্যবহাওে উদ্যোগ নেয়। বর্তমানে আণবিক শক্তি ব্যবহার জাপান মোট চাহিদার ৩০ ভাগ বিদুৎ উৎপাদন করে আসছে ; যেখানে ফ্রান্স ৭৫ ভাগ বিদ্যুতের চাহিদা মেটায় আণবিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে।

Dhaka University Institutional Repository

আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী, চীন, বৃটেন, কমবেশী সবাই আণবিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের বিদ্যুতের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। এখানে প্রশ্ন , জাপান কি বারবারই দূর্ভাগ্যের স্বীকার হচ্ছে, বিশেষ করে, পরমাণু শক্তির বিষয়ে? ৬৫ বছর আগের দুঃসহ স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগেই আর একবার পরমাণু তেজস্ক্রিয়তার শিকার হওয়া শুধুই কি কাকতালীয়, না পুঞ্জিভূত সমস্যার বহিঃপ্রকাশ তাও তলিয়ে দেখা দরকার। প্রকৃতির ওপর মানুষ যে অত্যাচার-অনাচার চালাচ্ছে এ তারই প্রতিশোধ। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সার্বিক ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে উঠে আসা একালের পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ দেশ। অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ঐতিহ্য, মানবিকতা, সিভিক ভারচ্যুর চর্চা-সবকিছুর জন্য অনুকরণীয় জাতি হিসেবে জাপানের অবস্থান অনেক ওপরে[২]।

শিন্তো, বৌদ্ধ এবং কনফিউসীয় ধর্মের প্রভাব সত্ত্বেও জাপানিরা মূলত ধর্মভাবের উপর দেশপ্রেমেকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছেন। জনৈক বিদেশী পর্যটক বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি জাপানিদের অনুরাগ দেখে এক সুপ্রসিদ্ধ জাপানি পুরোহিতকে একদা সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন মহাশয়, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হয়ে জাপান আক্রমন করেন, তা হলে আপনারা কি করবেন ? প্রত্যুত্তরে পুরোহিত মহাশয় নাকি বলেছিলেন "তাহলে বুদ্ধদেবের শিরচ্ছেদ করে মুন্ড নিয়ে জন্মভূমির পুজা করব"।

রুশ জাপান যুদ্ধ কালে (১১০৪-০৫) কোন এক জাপানি বৃদ্ধার একমাত্র যুবক সন্তানকে যুদ্ধে যোগদান করতে আহ্বান করা হলে সে তার বৃদ্ধা মাতার নিকট গিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

কাতরস্বরে নিবেদন করে যে বৃদ্ধা বয়সে তাকে নিঃসহায় অবস্থায় রেখে যুদ্ধে যোগদান করতে তার মন সায় দিচ্ছে না।

সেই সঙ্গে যুবকটি জানতে চায় এক্ষেত্রে তার করণীয় কি। বৃদ্ধা মাতা কোন উত্তর না দিয়ে পক্ষান্তরে প্রকাশ করেন এবং পুত্রের নামে একটি চিঠি লিখে তৎক্ষনাৎ আত্মহত্যা করেন। ইত্যবসরে যুবক পুত্রটি তার বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরে যা দেখতে পান তাতে তাঁর চক্ষুস্থির হয়ে যায়। বৃদ্ধার শেষ চিঠিতে যা লেখা ছিল তার মর্মকথা এইরূপ! ব্যস, তোমার মাতৃভক্তি প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু তোমার মন অতি ক্ষুদ্র দেখে আমি মর্মহত হয়ে আত্মহত্যা করলাম। তুমি জগতে এক নগন্য বৃদ্ধার জন্য তোমার ও তোমার পূর্ব পুরষদের এবং তোমার দেশস্থ সকলের অর্চনীয়া জন্মভূমিকে তুচ্ছজ্ঞান করছ। ধিক তোমাদের বংশে, আর ধিক তোমার গর্ভধারিনীকে[৩]।

কাজ করে জীবিকা নির্বাহ এবং আপন চেষ্টায় ধর্ম-সম্পত্তি অর্জন করার সব ধর্মেই স্বীকৃত এবং প্রসংসিত। ধর্ম মানুষের কৃ-প্রবৃত্তিগুলো দমন করে এবং তার মধ্যে পরাপকার প্রস্তুতি ও সহানুভূতির মনোভাব জাগিয়ে তোলে। তাছাড়া অবসরভোগী খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকরা শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের সাহায্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন যুগ হতে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ধর্মীয় চেতনা সামাজিক সংহতি রক্ষার্থে ক্ষমতাশালী শক্তি হিসাবে কাজ করে আসছে। একদিকে প্রচলিত মূল্যবোধ, সামাজিক রীতি নীতি, আচরন ধর্মকে সমর্থন লাভ করে জনগণের নিকট গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হবে। এর অপরদিকে এ সবই ধর্মাবলম্বীদের মাঝে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলে[৪]।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্য উৎস

১. মন্মথনাথ ঘোষ 'সুপ্ত জাপান'

পৃষ্ঠা-৬১

২. ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা-৯

৩.ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়, আধুনিক দূরপ্রাচ্য: চীন ও জাপানের ইতিহাস,

কোলকাতা-১৯৮৫,

পৃষ্ঠা নং ২২১

৪. The japan book.

Kodansha Intertional ,
Page no-87

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

জাপান বর্তমান বিশ্বে দ্বিতীয় অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভাবের কারণ যে শুধু তাদের কর্মদক্ষতা তাই নয় পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানবতাবোধ তাদের অর্থনৈতিকভাবে এ পর্যায়ে আনতে অন্যতম ভূমিকা রেখেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস পদ্ধতিতে, আচার, রীতি-নীতি ব্যক্তিকে তার জীবনের সদা পরিবর্তনশীল অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি নিশ্চয়তা প্রদান করে। যেমন-পবিত্র কোরান শরীফে আল্লাহ বলেছেন বিনা কারণে আমি কিছু সৃষ্টি করিনি। আর আল্লাহ যা করেন মানুষের কল্যাণের জন্যই করেন, যার কেউ নেই তার আল্লাহ আছেন ইত্যাদি বিশ্বাসগুলোর মাধ্যমে ধর্ম শুধু ভয়-ভীতির দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে।

জাপানী জাতি তাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে বিশ্বে মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে। তাদের কাছে কর্মই ধর্ম। কর্ম দিয়ে ভাগ্যের চাকা পরিবর্তন করছে। যে জাতি যতো বেশি পরিশ্রমী সে জাতি ততো বেশী উন্নত। এই বিশ্বাস নীতি নিয়ে জাপানীরা জীবন পরিচালিত করে থাকে। ধর্ম মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে এই বিশ্বাসবোধ তাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

বর্তমানে ছয় লাখ জাপানি মুসলমান আছেন সরকারি হিসাব অনুযায়ী। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী জাপানিদের মতো জাপানি মুসলমানেরাও শান্তিপ্রিয়। তাদের নিজেদের মধ্যে যেমন কোনো ভেদাভেদ নেই, তেমনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গেও নেই।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কাল থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। অর্থাৎ জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ধর্মেও প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আসছে। যখন প্রচীন সময়ে শিন্তো জাপানীজ সংস্কৃতির মেরুদন্ড ছিল তখন ষষ্ঠদশ থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যে শিন্তো উৎকর্ষতা লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম ষষ্ঠ শতকে প্রথম জাপানে প্রভাব বিস্তার করে। বর্তমানে ৯৬ শতাংশ জাপানীজ বৌদ্ধধর্ম পালন করে থাকে। জাপানীরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উৎসবকে ধর্মীয় উৎসব হিসাবে পালন করে থাকে। তানাবাতা, ওবন এবং খ্রীষ্টমাস ইত্যাদি তাদের মধ্যে জনপ্রিয় উৎসব হিসাবে পালিত হয়ে থাকে। জাপানী সমাজে সাহিত্য,সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রভাব অনেকাংশ বিস্তার করছে। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জাপানের অবস্থান ও তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ভূমিকা অনেক।

জাপানীরা সাধারণত আনন্দের অনুষ্ঠান, জন্ম ও বিয়ের সময় শিন্তো তীর্থকেন্দ্রে যায়, কিন্তু মৃত্যুর পর অনুষ্ঠানের জন্য বুদ্ধমন্দিরে যায়। জাপানে মন্দিরে গিয়ে ১০০ ইয়ন দিয়ে ভাগ্য ফলাফলের চিঠি কিনতে পাওয়া যায়। ঐ চিঠিতে ভবিষদ্বাণী লেখা থাকে। ঐ ভবিষদ্বাণীর কাগজটি তারা মন্দির প্রাঙ্গণে একটা বোর্ডে পিন করে রেখে দেয় আগত বিপদ হতে উত্তরণের জন্য।

ধর্মের দিক থেকে খ্রীষ্টধর্ম পুনর্জীবিত হয়, কনফিউসীয় ধর্ম স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধিত হয়। খ্রীষ্টধর্মের জনপ্রিয়তা, কনফিউসীয় ধর্মের স্তিমিত ভাব এবং বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার তথা পাশ্চাত্য দর্শনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশের ফলে জাপানে একটা আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১. The japan book.

Kodansha Intertional ,

২.শিন নিহোনগো কিছো

জাপান ফাউন্ডেশন।

3.Nihongo de manabu nihonjijo.
Tokyo,Japan

4 .G.B Sanson,Japan.
A short Cultural History,

৫. জাপানের ইতিহাস

ড.হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

৬.আধুনিক দূরপ্রাচ্য চীন ও জাপানের ইতিহাস

ড.সিদ্ধার্থ গুহ রায়,

৭.ভারতের ইতিহাস পরিক্রমা

অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি।

৮.সুপ্ত জাপান,

মন্মথনাথ ঘোষ

৯.একাল ও সেকাল

রাজনারায়ণ বসু

১০.জাপানে ও পারস্যে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

Dhaka University Institutional Repository

১১.The history of the far east in modern times,

Harold M.Vinacke

১২.History of japan

K.S Latourette

১৩.জাপান থেকে মেক্সিকো

ড:আব্দুস সাত্তার।

১৪.এশিয়ার ভ্রমণ গল্পো

ইকতিয়ার চৌধুরী।

১৫. নব্য জাপান

মন্মথনাথ ঘোষ।

১৬.ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান-সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ

অধ্যাপক মতিয়ার রহমান।

১৭. A short economic history of modern japan,

G.C Allen

১৮. Japanese Religion,

Earhart.

১৯. তোমো (ম্যাগাজিন)

২০.বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান

ডাঃ মরিস বুকাইলি

২১.সমাজ বিজ্ঞান পরিচিতি

ডঃ হাবিবুর রহমান।

২২. Primitive culture-১৮৭৪

E.B Tylor

Dhaka University Institutional Repository

২৩.Yomi no kuni,

Encyclo Vol.3